অ
নো
খী
লা
ল
প
খো
টি
য়া

অনোখীলাল পখোটিয়া

বিক্রমাদিত্য

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই জ্যৈষ্ঠ,
১৮৮০ শকাব্দ

দু টাকা
আট আনা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা ৬
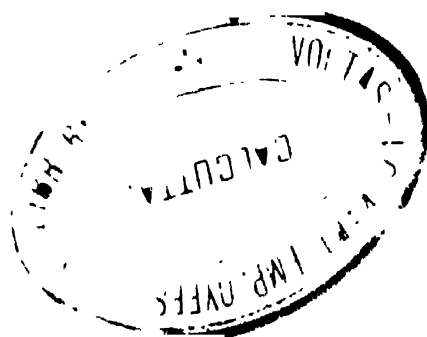
কাহিনীর সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত কারু সাথে কোন সাদৃশ্য নেই। রচনাকাল ১৯৫৩-৫৪। ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক 'যুগবাণী' ও মাসিক 'তরুণের স্বপ্ন'-এ প্রকাশিত।

—লেখক
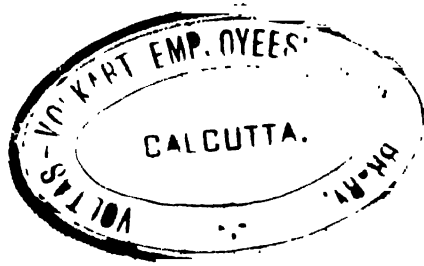
ব্যবসায়ী মহলে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শেয়ারের দাম বাড়ে নি, ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে নি, এমন কি ভবিষ্যতে যুদ্ধ লাগবার কোন সম্ভাবনা নেই। তবু ব্যবসায়ীরা সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। দোকান-পাট ঠিকমতো খুলছে না, কারু মুখে হাসি নেই, কেনা-বেচা বন্ধ হয়েছে। ব্যবসায়ে হঠাৎ মন্দা আসবার কি কারণ? তবে কী সরকার নতুন ট্যাক্সো বসাচ্ছেন? সে তো বসেই গেছে। তবে?

হ্যাঁ, গতকাল শোনা গেছে যে সুপ্রসিদ্ধ রিটায়ার্ড ব্যবসায়ী অনোখীলাল পখোটিয়া আত্মজীবনী লিখছেন। আত্মজীবনী বললে ভুল হবে, কারণ এতে শুধু মাত্র তাঁর জীবন-স্মৃতি বর্ণনা করা হবে না, তাঁর বাল্য ও কর্মজীবনের বন্ধু ও সহকর্মীদের কাহিনীও এতে থাকবে তা শোনা গেছে। এ হেন আত্মজীবনী প্রকাশ হলে সমস্ত রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী মহলে রীতিমতো আলোড়ন এনে দেবে। পখোটিয়ার রঙীন জীবন-চরিত্র প্রকাশ হলে বহু গুপ্তকাহিনী এবং তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

তাঁর বাল্য ও কর্মজীবনের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত আছেন তাঁরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, পখোটিয়া এককালে দুর্দমনীয় সিংহপুরুষ ছিলেন। জীবনে এ হেন কাজ নেই যা তিনি করেন নি। তাঁর পরিচালনায় কতো ব্যাঙ্ক অতল গর্ভে ডুবে গেছে, কতো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তা বলা যায় না। পখোটিয়া তার হিসাবও রাখেন নি এবং রাখবার চেষ্টাও করেন নি। তাঁর একমাত্র সংকল্প ছিল যে জীবনে তিনি ব্যাঙ্ক ফেলের একটি সিলভার জুবিলী করবেন। তাঁর দুর্ভাগ্য যে, মাত্র তেইশটি ব্যাঙ্ক যখন তাঁর

পরিচালনায় লুপ্ত হয়েছে তখন সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন। আর শুধু কী তাই! রাতারাতি তাঁর বিরুদ্ধে সরকার সাক্ষী যোগাড় করলেন এবং দোষী প্রমাণ করতে একটুও বেগ পেলেন না। যাঁরা এককালে তাঁরই পয়সায় স্ফূর্তি করেছেন, তাঁদের নিয়ে ঝঙ্কারিণী দেবীর সঙ্গে সান্ধ্য-ভ্রমণ করেছেন, তাঁরাই বেমালুম তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে এলেন। পখোটিয়াকে দায়রা জজ তিন বৎসর জেল দিলেন।

আজ একমাস হলো পখোটিয়া কারামুক্ত হয়েছেন। কয়েদখানার বাইরে এসে তিনি নিতান্ত একা অনুভব করলেন। প্রথমে ঠিক করলেন যে তিনি তীর্থ করতে যাবেন। জীবনে বহু পাপ করেছেন, তার স্খালন করার একান্ত প্রয়োজন।

বহু পুরাতন ভৃত্য শিবচরণ ওরফে শিউচরণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পুরীধামে জগন্নাথ দেব দর্শন করতে এলেন। স্টেশনে একদল পাণ্ডা ছেঁকে ধরল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাণ্ডা চক্রধরই তাঁকে বাগালে। চক্রধর শিক্ষিত, লেখাপড়া জানে, সে তার বই খুলে বলল,—আরে শেঠজী এই দেখুন, আপনার পিতা, চিম্ত্রিমল পখোটিয়া আমার এখানে ছিলেন। আপনার পিতামহ চুকন্দর পখোটিয়া, প্রপিতামহ বজ্রংগ পখোটিয়া, আরে আপনি দেখছি কৃত্তিবাসের বংশধর। আপনার পরিবারের সঙ্গে ওঁর নাম জড়িয়ে আছে।

কিরতিবাস? সে কুন আছে?—অনোখীলাল পখোটিয়া প্রশ্ন করেন।

—বাঃ রে, শেঠজী কৃত্তিবাসের নাম শোনেন নি। রামায়ণ লিখেছিল কৃত্তিবাস, তারই কথা বলছি। বই লিখে পয়সাও বানিয়েছিল লোকটা।

সে হামায় তো কুছু দিলো না। হামার যব পোয়সার তখলিফ চোলল, উসবখৎ দোচার পয়সা ছোড়িয়ে দিতো, তব তো হমার ভী

কুছু ফয়দা হোতো। আরে, কামকা বখৎ যব পয়সা না দিলো তব রিস্তাদার সমঝিয়ে কী লাভ আছে, পাণ্ডা সাহেব,—এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে পখোটিয়া জবাব দেন।

চক্রধর বলে,—আরে শেঠজী, ওর টাকার কি আর কিছু রেখেছিল। বারো ভূতে লুটে খেয়েছে। তোমাদের যা বংশ! এবার চল আমার বাড়িতে।

একরকম জোর করেই চক্রধর, পখোটিয়া ও শিউচরণকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল।

একদিন সন্ধ্যায় চক্রধর পখোটিয়াকে বললে—আপনি কৃত্তিবাসের বংশধর। আপনার কি এরকম বসে থাকা ভালো দেখায় শেঠজী। আমি বলি কি আপনি বই লিখুন।

—কেতাব লিখন্ মে পোয়সা যাদা নহী আছে। যব হমি ব্যবসা কোরতাম, কেতো বংগালী লেখক হমার কাছে আসিয়ে নোক্‌রীকে লিয়ে ঝামেলা কোরতো। বোহুত ঝক্‌মারি আছে ইস কাম মে।

—একটুও না। একবার লিখতেই শুরু করে দিন না, দেখবেন কতো পয়সা আসবে। প্রথমে লিখুন আত্মচরিত, তারপর রসোপন্যাস। পরে জাসুস কা কাহিনী, আর যখন বাজারে নাম হয়ে যাবে তখন লিখবেন প্রেমের গল্প। প্রথমে কঠিন প্রেম, তারপর হাল্কা প্রেমের গল্প। যদি সময় থাকে তো লিখবেন গদ্য কবিতা।

—আরে সাহ্‌ব, এহি তো বোহুত তখলিফ্ কী কাম আছে, হম্‌সে কবিতা না নিক্‌লেগী।

কঠিন একটুও নয়—চক্রধর জবাব দেয়। গদ্য কবিতা লেখা একদম জলের মতো সোজা। প্রতি লাইনের শেষে থাকবে চামচিকের বর্ণনা আর গিরগিটি ছানার প্রেমের ফিলসফি। আর যদি মডার্ন

বামপন্থী কবিতা হয় তবে দু'চারবার 'বুভুক্ষা' কথাটা উল্লেখ করলেই চলবে। কবিতার মর্ম যতো কঠিন হবে, বাহবা ততো বেশী মিলবে।

চক্রধরের কথাটা ভেবে দেখে পখোটিয়া। কথাটা মন্দ বলে নি চক্রধর। সমস্ত ব্যবসায়ই তো করে দেখল, কিন্তু সাহিত্যের ব্যবসা সে এখনও করে নি। একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক না। আর এতে যখন 'ইনভেস্টমেণ্টের' কোন প্রয়োজন নেই। আর শুধু তাই নয়, এই অজুহাতে নিজের আত্মচরিতও লেখা হয়ে যাবে। অনেকদিন থেকেই তার আত্মজীবনী লেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মনস্কামনা পূর্ণ করে উঠতে পারে নি। সে শুনেছে যে আত্মচরিত লেখা বড় হবার প্রথম সোপান। অর্থাৎ বড় হয়ে কেউ আত্মচরিত লেখে না, কারণ তখন ভক্তবৃন্দই জীবনী লিখে। আত্মচরিত লিখেই সবাই বড় হয়, এই সে শুনেছে। কাজেই একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক না। আর তার আত্মচরিত ডিটেকটিভ্ গল্পের চাইতে লোমহর্ষক, প্রেমের কাহিনীর চাইতে হৃদয়-বিদারক, প্রবন্ধের চাইতে জটিল। আজও যখন তার সে-সব পূর্বস্মৃতি জেগে ওঠে তখন হৃদয়টা টনটন করে ওঠে। ঝংকারিণী, পল্লবিনীর কথা এখনও সে ভুলতে পারে নি। দি গ্রেট্ রিপাবলিক ব্যাঙ্কের অন্তর্ধানের পরেই ঝংকারিণীকে নিয়ে সে কাশ্মীর গিয়েছিল। পল্লবিনীর সঙ্গে তার পরিচয় হয় দি কাস্পিয়ান কোল্ড স্টোরেজ কম্পানি ফেল পড়বার পর। কি করে তারা পুলিশের হাত এড়িয়েছিল তা এত রোমাঞ্চকর যে লিখতে বসলে আর ফুরোবে না। ছকু ভোসের পার্টনারশিপে নর্থপোল কটন মিলসের ঘটনাও বেশ চমৎকার। তার অন্যান্য পার্টনার শাদীলাল ছুছুন্দর, মিঃ বাইভি মেটারের কাহিনী তো আছেই। অবশ্য এ ছাড়া চুনোপুঁটি অন্যান্য ব্যবসায়ী বন্ধুদের কাহিনীও সে কিছুটা লিখবে। এইসব কাহিনী লিখে দেখাই যাক না একবার।

তিনদিন পরে কলকাতায় ফিরে এসে অনোখীলাল তাঁর ভৃত্য সেক্রেটারী শিউচরণকে হুকুম দিলেন,—শিউচরণ, হমারা লিয়ে ছ রিম সফেদ কাগজ, দো ডজন কলম, আধা ডজন ফাউন্টপেন্‌কা কালী লে আও। হমার জীবনচরিত লিখবো। কোই পাওনাদার আস্‌বে তো কহিয়ে দিবি যে হম্ সবকোইকো জীওন কাহিনী লিখ্‌নে মে ফাঁসিয়েছি।

প্রথমে এলেন ছকু ভোস।

ছকু ভোস বর্তমানে হায় হায় ইন্‌সিওরেন্স কম্পানির চেয়ারম্যান ও খট্‌ খট্‌ জুট মিলসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। বহুদিন যাবৎ তিনি ও অনোখীলাল বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু অনোখীলাল যখন জেলে গেলো, তখন ছকু কোর্টে দাঁড়িয়ে তারই বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিলেন। সে কাজটা ভালো করেন নি। ঝংকারিণীর মাসোহারাটা অনোখীলালই দিত, কিন্তু তার কারাবাস হবার পর সেটা এখন তাকেই দিতে হচ্ছে। মাসে তিনহাজার রৌপ্যমুদ্রা ও একখানা গাড়ী ও বাড়ি, একুনে ছয় হাজারের মতো খরচ। তাই আজ তিনি এ ব্যাপার নিয়ে অনোখীলালের সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করতে এসেছেন। ঠিক করেছেন যদি প্রয়োজন হয় তবে আর সাক্ষী দেবার ব্যাপারটিও মীমাংসা করে যাবেন। কিন্তু শিউচরণের মুখে অনোখীলালের সংকল্পের কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ কী ব্যাপার? অনোখীলাল আত্মজীবনী লিখছে। নিশ্চয় এতে তারও নাম উল্লেখ থাকবে। তাই শিউচরণকে বললেন: বলো কী হে? তোমার মনিব তাঁর জীবনী লিখছেন! পাগল হয়ে যায়নি তো?

—না হুজুর। একদম বহাল তবিয়তেই আছেন বলতে হবে। আজকে ভোরেই আমায় জিজ্ঞেস করছিলেন,—শিউচরণ, দি গ্রেট

রিপাব্লিক ব্যাঙ্ক যব ডুবলো, হমারা সাথ্ কোন্ কোন্ ডাইরেক্টর ছেলো। হমার তো বিলকুল ইয়াদ্ আছে কী ছকু ভাস্থু ভী উসবখত হমার পার্টনার ছেলো।

একটা করুণ আর্তনাদ করে উঠেন ছকু ভোস। বলেন ঃ একদম মিথ্যে কথা। আমি শুধু মাত্র শেয়ার-হোল্ডার ছিলাম। ব্যাঙ্ক লাটে ওঠার আগে চার মাসের জন্যে লুটেরা চৌবের জায়গায় ডাইরেক্টর বোর্ডে প্রক্সি দিচ্ছিলাম। আসলে সব কাজই তো অনোখীলাল করতো। ওকে কতোবার বলেছিলুম যা কিছু বাগিয়েছ ওটা দিয়ে দেবোত্তর বা ট্রাস্ট সম্পত্তি করে রাখো। সরকারের বাপেরও ক্ষমতা নেই তোমায় ধরে। আমার কথা তো শুনলো না, তাই ও ধরা পড়ে গেলো। নইলে ধরে কে ?

তারপর গলাটা একটু খাটো করে বললেন ঃ শিউচরণ একটা কাজ তোমায় করতে হবে। এর পরে যদি কখনো তোমায় অনোখী জিজ্ঞেস করে যে আমি কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলাম কি না, তুমি স্পষ্ট অস্বীকার করবে। বলবে, জানিনে। তা হলে ও আর কোন কিছু মনে করতে পারবে না। এই নাও পাঁচ টাকা বকশিশ।

ছকু ভোস একটি পাঁচ টাকার নোট শিউচরণের হাতে গুঁজে দিলেন।

আধঘণ্টা পরে শাদীলাল ছুচুন্দর দেখা দিলো। বিখ্যাত ব্যাঙ্কার ও কটন মার্কেটের রাজা শাদীলাল। মার্কেট তো তার কথাতেই ওঠে বসে। এককালে শাদীলাল অনোখীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। যেখানে অনোখীলাল সেখানেই শাদীলালের দেখা পাওয়া যেতো। প্রবাদ ছিল যে অনোখীলাল শাদীর পরামর্শ বিনা কোন কাজে হাত দিতেন না এবং শাদীও সমস্ত কাজে অনোখীর সাহায্য নিতেন।

গুজব যে অনোখীর জেল হবার আগে এই বন্ধুত্ব ভেঙ্গে যায় এবং জনশ্রুতি আছে যে শাদীই সরকারকে অনোখীর সমস্ত গোপন তথ্য বলে দিয়েছিলেন। ঝগড়াটা নাকি হয়েছিল পল্লবিনীর কাছে লেখা একটি পত্র নিয়ে। একদিন অনোখীলাল পল্লবিনীকে এক পত্র লিখেছিল। চিঠিতে লেখা ছিল : ছুঁচো কো বিশোয়াস্ মত্ করো। ও বদমাশ আছে। এক রোজ তুমহার সব কুছু লিয়ে ভাগবে।

পল্লবিনী যে সময়ে চিঠি পড়ছিলেন ঠিক সেই সময়ে আর একটি চিঠি এলো। পত্রদাতার নাম শাদীলাল ছুচুন্দর। লেখা ছিল : মেরী জান, অনোখীলাল ডাকু আছে। হমার কাছে খবর আনিছে কী ও তুমকো ধোঁকা দিবে। ঝংকারিণীকে লিয়ে সে বহুত মৌজ করছে। ও তুমহার সবকোই পোয়সা চোরি কোরবে।

পল্লবিনীর সেই মুহূর্তে কি দুর্মতি হয়েছিল জানা যায় নি। সে অনোখীর চিঠি শাদীলালকে এবং শাদীলালের চিঠি অনোখীর কাছে পাঠিয়ে দিল ; এবং পরিণাম যে কি হয়েছিল তা অনুমান করা অবশ্য কঠিন নয়। দুই বন্ধুতে কথাবার্তা বন্ধ হয়েছিল এবং সে ফাটল আজ পর্যন্ত জোড়া লাগে নি। অবশ্য অনোখীর জেলে যাবার পর শাদীলাল একটু অনুতপ্ত হয়েছিলেন, কারণ তার অল্প কয়েকদিন পরই শাদীলাল একদিন পল্লবিনীর বাড়িতে গিয়ে শুনল যে, পল্লবিনী রায়সাহেব লুট বাহাদুরের সঙ্গে কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়েছেন।

আজ শাদীলাল বন্ধুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছিল। বাইরে থেকে সে হাঁক দিল : আরে অনোখীলাল, কেয়া কর্ রহে হো ভাই। দর্শন দে দেও।

শিউচরণ জবাব দিল : আজ্ঞে, হুজুর তো আজকাল কারু সঙ্গে দেখা করেন না। ব্যস্ত আছেন। আমায় বলে দিয়েছেন যে কেউ এলে বলবি দেখা হবে না।

—কিউঁ, অনোখীলাল তো হমার বহুত্ পুরানা দোস্ত আছে। উস্‌সে হমি জরুর মোলাকাত করিয়ে যাবো।

· উনি বই লিখছেন। উনি চান না যে কেউ ওঁকে কাজে ব্যাঘাত করুক।—শিউচরণ জবাব দেয়।

—অনোখীলাল কেতাব লিখছে! আরে রাম রাম! আরে শিউচরণ, কেতাব কোন্ চীজকা উপর লিখছে?

আত্মচরিত। নিজের বাল্য ও কর্মজীবনের কাহিনী,—শিউচরণ বলে।

—এহি তো বোহুত শরম কী বাত আছে। আপনা আত্মা চরিত লিখন মে কেয়া জরুরত আছে। লালবাজার থানা যাকে পুলিসকা ডায়েরী দেখিয়ে লিন। হমার জীবনচরিত ভী ওহি জগহমে আছে—অনোখীকা ভী আছে। তারপর গলা নামিয়ে বললেন—শিউচরণ, হমারী বাত উস্‌মে কুছু আছে?

—এ তো জানি নে, আমায় মনিব পরশুদিন বলছিলেন, শিউচরণ, হমি যে সোন্দরবনে তেল কা কম্পানি খুলিয়েছিলাম উস্‌কা উপর বহুত বঢ়িয়া লিখা হ্যাঁয়।

—এঁ্যা, উভী লিখছে?

—হ্যাঁ, তাই তো আমায় পড়ে শোনালেন। লিখেছেন, শাদীলাল হমার পোয়সা চোরি কিয়েছে। ফাস্ট কলকা রুপেয়া······

—বোহুত ঝুট লিখেছে। আরে শেয়ারকা ফাস্ট কলকা রুপেয়া ওহি তো নিলো। দুসরা কলকা আধা রুপেয়া হমে দিলো, বাকী পোয়সা তো ওহি রাখলো। একরোজ মে তো ও পোয়সা দারু পিকে ওড়িয়ে দিলো।

—কিন্তু মনিব আমায় বলেছিলেন আপনি নাকি সেদিন মদ খেয়ে চুর হয়ে টেবিলের তলায় হামাগুড়ি দিচ্ছিলেন। আমার মনিব আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেন।

—তোবা, তোবা, হমি দরু পিকে চুর হয়েছিলাম? বিলকুল ঝুট আছে। হমার তো ইয়াদ আছে যে ওহি রোজ একাদশী ছিল। একাদশী রোজ হম কভি দরু না পি না ভি শুংখি। রামজী কা কিরিয়া আছে। আচ্ছা শিউচরণ, মেরী এক বাত তো শুনো। অনোখীলাল যে কেতাব লিখছে উস্‌মে কেয়া কেয়া কিস্সা লিখছে হমকো পহেলে পহেলে বাতা দেনা। পান খানে কা লিয়ে আপনা পাশ তো দশটো রূপেয়া রাখ দে। আউর কভি কোই পোয়সা কা জরুরত হোবে তো হমার পাশ আসবি।

একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে শাদীলাল গম্ভীর হয়ে নিজের গদীতে ফিরে গেলেন।

"মাই গড, ইউ ডোণ্ট ওয়াণ্ট মি টু বিলিভ যে অনোখীলাল তার অটোবায়োগ্রাফি লিখছে"—অনোখীর সংকল্পের কথা শুনে বাইভি মেটার মন্তব্য করলেন।

বাইভি মেটার, বি. এন. জি. এস. অর্থাৎ বিলাত না গিয়ে সাহেব ন'ন, খাঁটি বি. জি. এস. অর্থাৎ বিলাত গিয়ে সাহেব। একেবারে পুরোদস্তুর সাহেব। এককালে অনোখীর প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র পার্টনার ছিলেন, বর্তমানে দি মেডিটারেনিয়ান ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা, দি য়্যাটলান্টিক আণ্ডার-কারেণ্ট ইলেকট্রিক কম্পানির চেয়ারম্যান, নাগাসাকি জুট মিলসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। আজ কয়েকদিন হলো ব্যাঙ্কটি নিয়ে একটু মুশকিলে পড়েছেন। বহুদিন আগে য়্যাটলান্টিক আণ্ডার-কারেণ্ট ইলেকট্রিক কম্পানির নাম দিয়ে তিনি ব্যাঙ্ক থেকে একটি ওভারড্রাফ্‌ট নিয়েছিলেন। তার সংকল্প ছিল এই ওভারড্রাফটের বদলে তিনি ব্যাঙ্ককে ইলেকট্রিক কম্পানির কিছু ডেফারড্‌ শেয়ার দিয়ে দেবেন। কিন্তু ইলেকট্রিক কম্পানির যে প্রকার আণ্ডার-কারেণ্ট বইছে এতে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণ রাজী হবেন কিনা

সন্দেহ। শুধু তাই নয়, নাগাসাকি জুট মিলস্‌কে ব্যাঙ্ক যে টাকা এডভান্স করেছে তা নিয়েও গোল বেধেছে। এইসব কারণেই তিনি অনোখীলালের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতে এসেছেন। কারণ বহু বছর আগে একবার অনোখীলাল ব্যাঙ্ক থেকে জুট মিলসের ওভারড্রাফট্‌, জুট মিল কটন মিলের শেয়ার, কটন মিলসে ইনসিওরেন্স কম্পানির ইনভেস্টমেণ্ট, ইনসিওরেন্স কম্প নিতে ব্যাঙ্কের এডভান্স নিয়ে এমন একটি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন যে তার হিসেব নিকেশ করতে গিয়ে ভারত সরকারের ইন্‌কাম ট্যাক্সের চারজন পদস্থ কর্মচারী এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ও ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের অফিসারেরা পাগল হয়ে যান এবং পুরো একটি বছর মেডিকেল লিভ নিয়ে রাঁচিতে বাস করতে হয়। অতএব এই জটিল ব্যাপারে অনোখীলাল যে তাকে বিশেষ সাহায্য করতে পারবেন এই মতলব নিয়ে বাইভি মেটার অনোখীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কিন্তু শিউচরণের মুখে অনোখীর সংকল্পের কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অনোখী কি জেলে গিয়ে পাগল হয়ে গেল! তার কি সমস্ত বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে! বাইভি মেটার ভাবতে লাগলেন। তারপর শিউচরণকে বললেন: শিউচরণ, ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস দেখতে পাচ্ছি। তুমি ঠিক জানো শিউচরণ, অনোখী তার আত্মজীবনী লিখছে। এমনও তো হতে পারে যে ডিটেকটিভ বা প্রেমের কাহিনী লিখছে।

—না, না, আমি কাল স্পষ্ট শুনলুম যে মনিব বিড়বিড় করে বলছেন আর লিখছেন—"হমি টেবিল কা উপর, আউর বাইভি টেবিলকা নিচে আছে। বাইভি বোহুত পিয়েছে।"

—গুড হেভেন্স্‌, এইসব কথা লিখেছে। বাই জোভ্‌, একদম ডাহা মিথ্যে কথা। সব গুলিয়ে ফেলেছে। ওটা আমি নয়,

নিশ্চয় ছকুর কথা বলতে গিয়ে আমার নামটা মেন্‌শন করেছে। আচ্ছা, শিউচরণ তোমার মনিবকে এই বই লিখতে মানা করতে পারো না। ও তো তোমার কথা কিছু শোনে।

—আমি বলেছিলুম, কিন্তু মনিব বললেন ঃ শিউচরণ, হমায় তুই মানা করিস না। বাইভি হমার বোহুত পোয়সা লুটেছে। হমি ওর সব কুছু বোলিয়ে দেবো। রেস ময়দানে হমার সাথে আউর ধোঁকাবাজি চোলবে না। আচ্ছা, মনিব আমায় জিজ্ঞেস করছিলেন যে নোবেল প্রাইজ না কি একটা প্রাইজ আছে, সেটা পেতে হলে কোন্ ভাষায় বই লিখতে হয়।

—বলো কী হে, এই বই নোবেল প্রাইজের জন্যে পেশ করবে। নো, সামথিং শুড্ বী ডান্ টু ইট্। নইলে একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।

ব্যস্ত হয়ে বাইভি মেটার চলে গেলেন।

হ্যালো !

হ্যালো !

ছকু।

বাইভি।

শোন, একটা কথা

শুনছি, বল।

আমি বলছিলুম কী

কী বলছিলি……

ব্যাপারটা শুনেছিস ?

কোন্ ব্যাপারটা ?

এই সেই ব্যাপারটা।
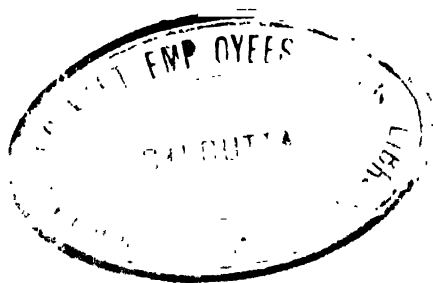
কোন্‌টা? বৃন্দাবন ফিল্ম কম্পানি, না আণ্ডার-কারেণ্ট ইলেকট্রিক কম্পানির?

আরে না, শুনিস নি যে অনোখী তার আত্মজীবনী লিখছে?

ওঃ এই কথা. আমি ভাবছিলুম তুই বুঝি বিদ্যুৎলতার কথা বলবি। তা, অনোখী আত্মজীবনী লিখছে—এতে কি হলো?

না, কিছু হয়নি, তবে জানিস, এই বুড়ো বয়সে এই সব পুরনো সেকালে কথা ঝালানো কি উচিত? লোকটা নিশ্চয়ই পাগল হয়েছে।

কী বল্‌লি, পাগল হয়ে লিখছে, না লিখে পাগল হয়েছে।

না, তোকে বলে কিস্‌সু লাভ নেই। তুঁই কিছুই বুঝিস না।

আর তুই বুঝি সব বুঝিস্‌। সেবার গ্রেট্‌ হোক্স্‌ কটন মিলের একাউণ্ট একদম গোলমাল তো তুই না বুঝে করে ফেল্‌লি।

মিথ্যে কথা। আমি করেছিলুম, না তুই?

কী আমায় মিথ্যেবাদী বল্‌লি! তুই কী রে তাহলে, ছুঁচো?

ছ্যাখ, আমায় ছুঁচো বলিস নি। স্কাউণ্ড্রেল!

বাটপাড়, হনোলুলু—

ইডিয়ট, কামস্কাটকা—

পাঁচ মিনিট বাদে আবার টেলিফোন বেল বেজে উঠল।

হ্যালো!

হ্যালো!

ছকু।

বাইভি।

রাগ করেছিস?

পাগল, আমি ভাবলুম তুই বুঝি চটে গেছিস।

ছ্যাখ, এই ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করে লাভ নেই। এতে আমরা

সবাই যে 'ইনভলব্‌ড্‌'। অনোখীর আত্মজীবনী সম্বন্ধে একটা কিছু বিহিত করার প্রয়োজন।

আমার কিন্তু ভাই একদম ক্লীন রেকর্ড। ও যাই লিখুক না কেন, আমায় এতে জড়াতে পারবে না।

দি সেম্‌ থিংগ উইথ মী। নেভার কমিটেড এ সীন ইন্‌ মাই হোল্‌ লাইফ।

তবে কী জানিস, আরো অনেকে আছে যাদের নামে হয়তো অনোখী যাচ্ছেতাই লিখবে। এটা প্রকাশ হওয়া উচিত নয়। অন্যের দিকটাও তো আমাদের দেখা দরকার।

উঃ, কি আনপ্রফেশনাল কাজ করছে দেখছিস্‌। আমি বলছিলুম কী যে, সরকারের কাছে মুভ করলে হয় না যে বইটা 'ব্যান' করে দিক।

দি আইডিয়া! শোন, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের এসোসিয়েসনের এক মিটিং হওয়া দরকার। সবাই মিলে এর একটা বিহিত করা যাবে। যদি দরকার হয় তা হলে সরকারের কাছে মুভ করা যাবে।

যা বলেছিস, একবার শাদীলালকে জিজ্ঞেস করে ছাখ না। মিটিং হলে বলিস।

আরে ছকুয়া রে, শুনল্‌ বা।

কে শাদীলাল, কী বলছো!

তুমারা দোস্ত অনোখীকো দিমাক খরাব হয়ে গেছে। হমার কাছে খবর এসেছে যে ও এক বঢ়িয়া কিতাব লিখছে। রামায়ণকা মাফিক হোবে। সবকোই কো নাম ভী থাকবে।

শুধু কি আমার বন্ধু, তোমার নয় বুঝি?

কোই ফারক্ নহী। কোই ফারক্ নহী। আসলি চীজ কী হলো জানো, অনোখী হমে সব কোই কো পানিমে ডুবাইবে। এহি খবর শুনে হমার নিদ ভী টুটে গেছে।

আমার বুঝি ঘুম হচ্ছে!

আভি তো কুছু কাম করো, নহী তো অনোখী কা কিতাব বাজারমে আসিয়ে যাবে।

সে কথা কি আর ভাবিনি ছুচুন্দর। ঠিক করেছি যে দি গ্রেট বিজয়ডঙ্কা মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশনের এক বিশেষ জরুরী সভা করে সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা যাক।

আলবত করনা চাহিয়ে। তব ছকুয়া রে, ইয়াদ্ রাখ্না শনিচর কোই মিটিং না করনা। হমার ঘোড়দৌড়কা খেল ভী আছে, আউর রাতকো একবার টহলনেকো যেতে হোবে।

তারপর একদিন দি গ্রেট বিজয়ডঙ্কা মার্চেন্টস এসোসিয়েশনের মিটিং শুরু হলো। মিটিং-এর প্রথমে এলো চা, তারপর খাবার। এর পরে পান ও দোক্তা।

সভার কাজ শুরু হলো। সভাপতিত্ব করলে বাইভি। ছকু প্রথমে একটু আপত্তি করেছিল যে এই সভার পৌরহিত্যের ভার বাইভিকে দেওয়া হচ্ছে বলে। কারণ গতবার তার সভাপতিত্বে যে মিটিং হয়েছিল তা বাইভির দৌরাত্ম্যে শেষ হতে পারে নি। বাইভি মিটিং পণ্ড করে দেয়। কিন্তু ছকু এবারও বিশেষ সুবিধে করতে পারল না, কারণ শাদীলাল ও তার দলবল বাইভিকে সভাপতি করলে।

সভাপতির বক্তৃতায় বাইভি অনোখীলালের আত্মজীবনীর গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলেন। এই বই প্রকাশিত হলে যে তাঁদের বহু ক্ষতি হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাইভি প্রস্তাব করলেন যে তাঁদের এক প্রতিনিধিকে অনোখীর

কাছে পাঠান হোক। প্রতিনিধি স্পষ্ট বলে দেবে যে এই বই তারা কিছুতেই বাজারে বের হতে দেবে না।

আমি বলি কি,—ছকু বলে,—স্বামী খলিলানন্দকে পাঠানো যাক। স্বামীজি তো অনোখীর কুলগুরু। যতো দৈববাণী, স্বপ্নাদেশ তো অনোখীকে উনিই দিয়েছিলেন।

বোহুত উত্তম কথা বোলেছেন ছকুবাবু!—শাদীলাল ছুচুন্দর বলে। হমি ভী আপকা প্রস্তাব সোমর্থন করছি।

কিন্তু শুনছি স্বামী খলিলানন্দ একেবারে হমবগ, জোচ্চোর,—বাইভি মন্তব্য করেন।

ডোণ্ট টক্ রাবিশ,—ছকু উত্তেজিত হয়ে জবাব দেয়। ওঁর মতো এই রকম উঁচু দরের ফিলসফার গাইড পাওয়া দুষ্কর। তবে ওঁর রেট্‌টা একটু বেশী, এই যা। গতবার তো স্বামীজিই আমায় বলেছিলেন, ছকু, আকাশ কুসুম কটন মিলের শেয়ার কিনে রাখ। আমি কিনলুম, দু দিনের মধ্যে দাম হু হু করে বেড়ে গেল। ছ লাখ টাকা প্রফিট হয়েছিল।

তব্ আপ্ তো হমার সাথে ফোর টুয়েন্টি করিয়েছেন, ছকুবাবু। আপ্ হমকো তখন বলিয়েছিলেন, শাদীলাল, আকাশ কুসুম কোটন মিলকা সবকোই শেয়ার ঝড়্‌তি-পড়্‌তি বেচিয়ে দেও। হমি বেচিয়ে দিলাম, আউর নাফা আপ ভী কোরলেন। বড়ি আফসোস কী বাত।

আরে, আমি তোমায় বলেছিলুম স্বামীজির সঙ্গে দেখা করবার আগে। আর জানো তো স্বামীজির সিক্রেট কনসাল্টেশনের দাম কতো। শুধু কী তাই—উনি দেবার সময় স্পষ্ট বলে দেন Not to be disclosed to any other source. এডভাইসের ভ্যালু নষ্ট হয়ে যায়। অনোখী তো ওঁর কথাতে উঠে বসে। ওঁকে না জিজ্ঞেস করে কোন কাজ করে না। দি গ্রেট রিপাব্লিক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা তো

স্বামীজিই করেছিলেন। পরে স্বামীজি অনোখীকে ডেকে বললেন,—দ্যাখ, তোর উপর শয়তানের নজর আছে। ব্যাঙ্ক তুলে দে, নইলে মারা পড়বি। তাই তো অনোখী ব্যাঙ্ক তুলে দিলে। অতএব আমি প্রস্তাব করছি যে অনোখীকে বই লেখা থেকে নিরস্ত করার ভার স্বামী খলিলানন্দকে দেওয়া হোক।

ইতিমধ্যে বইয়ের বাজার গরম হয়ে উঠল। অনোখীর আত্মজীবনী প্রকাশ করার জন্যে চারটা পাবলিশার্স ফার্ম গজিয়ে উঠল। শোনা গেল যে, প্রথম দশ এডিশন বুক্‌ড্‌ হয়ে গেছে। বইটাকে রম্যরচনা, না আত্মজীবনী পর্যায়ে ফেলা হবে—এ নিয়ে বাক্‌-বিতণ্ডা শুরু হয়ে গেলো।

কলকাতার রাস্তা-ঘাট নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপনে ছেয়ে গেলো। পড়ুন—দি গ্রেট রিপাব্লিক ব্যাঙ্ক কেন ফেল পড়লো,—হায় হায় জুট মিল লাটে উঠল কবে,—পল্লবিনী ঝংকারিণীর প্রেম কাহিনী।

'স্যর, বড্ড বিপদ হয়েছে।'

দপ্তরে বসিয়া ভৃত্যহরি কুম্ভ ঝিমুচ্ছিলেন। মনটা তার খিঁচড়ে আছে। কারণটা অবশ্য তৃতীয় পক্ষের গৃহিণীর সঙ্গে দপ্তরে আসবার আগে একটু ঝগড়া হয়ে গেছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে। গৃহিণী একটা 'লুটে নিলো মন' শাড়ী কেনবার বায়না করেছিলেন, কিন্তু ভৃত্যহরি দেন নি। শাড়ীর নামটা……করেছেন। কারণ আজ কয়েকদিন হলো, তিনি লক্ষ্য করেছেন—তার নবীনা স্ত্রীর মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এর পরে 'লুটে নিলো মন' শাড়ী পরলে কি হবে তা তো তিনি ভাবতেও চান না।

সহকারী ধূম্রবন হালদারের ডাকে তার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল

—কী হয়েছে ধূম্রবন ?

—অনোখী স্যর তার আত্মজীবনী লিখছে।

—অনোখী ? সেটা আবার কে ?

—ঐ যে স্যর গত ট্যাক্সের 'রং' রিটার্ণ দিয়ে জেলে গিয়েছিল।

—আরে রাম ঃ বলো আমাদের অনোখীলাল পথোটিয়া। তা ব্যাটা তো মুখ্যু হে। ও ব্যাটা আবার আত্মজীবনী লিখবে কী ?

—না স্যার, লিখছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে স্যর ঐ 'চাঁদচকোরী' ক্লাবের সম্পাদক লিখে দিচ্ছে।

—আত্মজীবনী লিখছে, বেশ করছে। এতে উত্তেজিত হবার কারণটা কি ?

—না স্যার, তিন বছর আগে ক্রীস্টমাসে আপনি আমার কাছ থেকে যে দু হাজার টাকা নিয়েছিলেন, ওটা স্যর অনোখীর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। কাল অনোখীর বাড়ি গিয়েছিলাম। ওর চাকর শিউচরণ বল্লে যে, অনোখী নাকি ওকে হুকুম দিয়েছে কাকে কাকে টাকা দে'য়া হয়েছে তার ফাইলটা খুঁজে বার করতে। আমি স্যর শিউচরণকে পঁচিশ টাকা দিয়ে বলেছি,—শিউচরণ ভাই, খাতাটা তুই খুঁজে বার করিসনি।

—বলো কী ধূম্রবন, অনোখীর এতো উপকার করলুম, সে আমাদের এখন ডোবাবে বলছো ?

—দেখে তো মনে হচ্ছে স্যর স্রেফ গঙ্গায় কলসী বেঁধে ছেড়ে দিচ্ছে। এখন উপায় ?

ভৃত্যহরি কুম্ভ কিছু বললেন না, চুপ করে বসে রইলেন। কথাটা ভাববারই বটে ! অনোখীর কাছ থেকে সময় অসময়ে অনেক সাহায্য তিনি পেয়েছেন। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, কিন্তু সে উপকারের প্রত্যুপকারও তিনি দিয়েছেন। অনোখী যে এভাবে

অকৃতজ্ঞতা করবে এ কথা তিনি ভাবতে পারেন না। উপায় তাকে একটা বের করতেই হবে। একটু ভেবে প্রশ্ন করলেন : ধূম্র, বই বাজারে বেরিয়েছে?

—না স্যর, তবে শুনেছি প্রথম দশ এডিশন নাকি অলরেডী 'বুক' হয়ে গেছে।

এরপর আর ভাববার সময় নেই। এখন এর একটা বিহিত না করলে পরে আর সময় থাকবে না। কিন্তু কি করবেন তিনি?

উপায় একটা আছে বৈ কি। কিন্তু সেখানে যাবেন কী? বহুদিন সে পথ মাড়ান নি। না আজ আর সেখানে না গিয়ে উপায় নেই। আত্মমর্যাদার চাইতে এটা অনেক বড়ো।

তাড়াতাড়ি তিনি বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

ধূম্রবন জিজ্ঞাসা করল : স্যর বাইরে যাচ্ছেন?—

—ভয় করিসনে ধূম্র। সব ঠিক হয়ে যাবে। অনোখী তার আত্মজীবনী আর লিখবে না। চিংড়িহাটার লুটিলুটি হালদারকে চিনিস তো। ওকে একবার বলে দেখি কী হয়। অনোখী ওর বাধ্যের লোক। ওর সমাজ-সেবা কমিটির প্রেসিডেণ্ট, ও নিশ্চয় একটা কিছু হিল্লে করে দেবে।

পাঁচবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় গ্র্যাণ্ড টোটালে শূন্য পেয়ে লতাধর সিংগী তার নাম পাল্টে স্বামী খলিলানন্দ রাখলে। ধুতি ছেড়ে গেরুয়া ধরলে এবং লম্বা বাবরী চুল রাখলে। তারপর হলো স্বামী খলিলানন্দ।

লতাধর কেন সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্য সাধনা শুরু করলে তার একটা ছোট ইতিহাস আছে।

লতাধরের পিতা পুলিশ দপ্তরের কাজ করতেন। ছেলে বহুবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবার পর ঠিক করলেন তিনি তাকে সেই দপ্তরে ঢুকাবেন, কিন্তু লতাধরের নসীব খারাপ। সিলেকসনের জন্যে যে রানিং কম্পিটিশন হয়েছিল তাতে সে লাস্ট হয়েছিল। অতএব তাহার চাকরি হলো না।

মাতুল শিকড়লাল এসে বললেন ঃ উঁহু, তোকে দিয়ে কিস্‌স্যু হবে না। আমি বলি কি তুই জার্ণালিস্ট হয়ে যা। আমার বন্ধু চটক মাশ্চটক 'ধাপ্পামার্কেট' কাগজের সম্পাদক। ওর কাছে যা, একটা কাজ দিয়ে দেবে।

চটকের কাছে লতাধর গেল সত্য, কিন্তু চাকরি হলো না। কারণ, চটকের মনটা তখন খিঁচড়ে ছিল। প্রথম কারণ, স্ত্রী মন্দাকিনী তার সঙ্গে ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে গেছেন; দ্বিতীয় কারণ, প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ 'গুলবার্তা' সেদিন সকালে একটি মনমাতানো সম্পাদকীয় লিখে পাঠকদের মন মুগ্ধ করে দিয়েছে এবং কাটতি বাড়িয়েছে। তিনি আজ ঠিক করেছেন 'গুলবার্তার' সম্পাদকীয়ের চাইতে একটি জোরালো সম্পাদকীয় লিখবেন। কি বিষয় নিয়ে লিখবেন তা নিয়ে গোল বেধেছে। প্রথমে ভেবেছিলেন যে রেশনিং ডিপার্টমেন্টের অকর্মণ্যতার উপর লিখবেন। কারণ গতকাল রাত্রে খেতে বসে ভাতে অনেক কাঁকর পেয়েছেন। চালে এত দুর্গন্ধ ছিল যে না খেয়ে উঠে যেতে হয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। তিনি ব্ল্যাকের চাল কেন জুটাতে পারেন নি। অফিসে এসে একটি কড়া প্রবন্ধ লিখবেন বলে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বের হলেন। কিন্তু চেয়ারে বসে মনটা চুপসে গেল, মত পালটে ফেললেন। সামনে ছিল একটি বই, মোহন জাপানে গিয়ে কি প্রকার বিপন্ন হয়েছিলেন তার হুবহু বর্ণনা দে'য়া হয়েছে। তিনি ঠিক

করলেন জাপানে ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে একটি কড়া প্রবন্ধ লিখবেন। কিন্তু লিখতে লিখতে হঠাৎ থেমে গেলেন। ঠিক মনে করতে পারছেন না যে জাপানের রাজধানী কোন্‌টা, ইয়োকোহামা না নাগাসাকি। বার্তাবহ সম্পাদক বলেছেন যে ইয়োকোহামা, কিন্তু তার ধারণা যে ওটা নাগাসাকি হবে। ঠিক এমন সময়ে লতাধর এসে হাজির হলেন। ভ্রূ কুচকে চটক জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি চাই!

উত্তর এলো ঃ চাকরি। মামাবাবু বললেন যে আমি নাকি ভাল জার্ণালিস্ট হবো।

—কি পর্যন্ত পড়েছো? চটক প্রশ্ন করলেন।

—ম্যাট্রিক অবধি। তবে পাশ করতে পারিনি।

—ক'বার ফেল করেছো?

—পাঁচবার।

—তা হলে হবে না।

লতাধর স্থান ত্যাগ করলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

চটক আবার লিখতে লাগলেন একটু বাদে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন যে লতাধর তখনও যায়নি তাই বললেন ঃ বললাম যে কিছু হবে না।

—আজ্ঞে, আমি কবিতা লিখতে পারি।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন চটক। বললেন ঃ হবে না। কবিতা আজকাল অচল। পারবে লিখতে 'কুহকিনীর ফাঁদ', 'পরলোকের প্রেতাত্মা', 'রক্তপাঞ্জার ছাপ'-এর মত রোমাঞ্চকর কাহিনী? পারবে দিনকে রাত করতে? মেয়েকে ছেলে বানাতে? যদি পার তো এসো একদিন। দেখি কি করতে পারি। কবিতা লিখছো যখন তখন যাও ইস্কুল মাস্টার হওগে।

লতাধর চলে গেল।

পাড়ায় ছক্কাপুর মাইনর স্কুলে একটি চাকরি খালি ছিল। লতাধর দরখাস্ত করলে। ইণ্টারভিউর ডাক এলো। ইণ্টারভিউ নিলেন স্কুলের প্রেসিডেণ্ট গিরিধারীলাল ছকপুরিয়া। লতাধরের বিত্যার কথা শুনে তার চক্ষু চড়ক গাছ! বললেনঃ বাবুজী, এহি তো বোহুত আফসোস কী বাত আছে। হমার ভাতিজা ছগনলাল ছকপুরিয়া পনরো সাল যব্ ফেল করলো, হমি বোহুত বড়া এক পার্টি দিলাম। গানা ভী হোলো, নাচ ভী হোলো, দশ হাজার রুপেয়া দান করলাম। হমার ভাতিজা উসকা বাদ সাল পাশ কোরিয়ে গেলো। তো আপ কেতো ঢালিয়েছেন?

—এক পয়সাও না।

—এহি তো খরাব কাম করিয়েছেন। আরে লছমীকে ছোড়িয়ে দিন, সরস্বতী উসকো সাথ সাথ লিয়ে আসবে। আপ বংগালী কুছু না জানে। সিধা রাস্তামে আপলোগ কভি না যাবেন।

কিন্তু চাকরিটা……একটু ভয়ে ভয়ে লতাধর প্রশ্ন করলে।

—হোবে না। হমি ঠিক করিয়েছি হমার চাইতে পড়াশুনা যার যাদা আছে উন্‌কো হমি কভি না লিবো। আপ কেতো সাল ফেল কোরিয়েছেন? পাঁচ সাল। হমি বিশ সাল। বাবুজী, হমার মাফিক লেখাপড়া জানতে হলে আউর পনরো সাল ভী পড়তে হবে।

সংসারের প্রতি লতাধরের বীতশ্রদ্ধা হলো। তিনি বাব্‌রী রেখে গেরুয়া পরলেন। বাপ চটলেন, মা কাঁদলেন, কিন্তু খুশী হলো ব্যবসায়ী মহল। কারণ স্বামী খলিলানন্দ ওরফে লতাধর তার অন্যান্য সহকর্মীদের মত নারীমহলে নজর দিলেন না। তিনি সাংসারিক দর্শনে অভিজ্ঞ, তিনি জানেন যেখানে অর্থ, সেখানেই তুনিয়া। অতএব ব্যবসায়ী মহলকে হাত করলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে তিনি বুঝতে পারলেন আধুনিক সংসারে এরাই হলো নির্যাস।

স্বামী খলিলানন্দের সঙ্গে অনোখীর পরিচয় হয় ঘুঘুডাঙ্গার বাগান-বাড়িতে। সেদিন ছিল খট্ খট্ জুট মিলসের প্রতিষ্ঠা দিবস। সারা রাত ধরে উৎসব চলল, কে কাকে ধরে নৃত্য করলে জানা যায় না, তবে পরদিন প্রভাতে দেখা গেল অনোখী ও খলিলানন্দ জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। দুজনেই বেহুঁশ।

চৈতন্য হলে অনোখী বলল ঃ গুরুজী!

খলিলানন্দ বলল ঃ বেটা!

ব্যস্, সেই যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হয়ে গেলো তাতে এখনও ফাটল ধরে নি।

ছকুর মুখে অনোখীর সংকল্পের কথা শুনে স্বামী খলিলানন্দ একটু ভাবতে বসলেন। তারপর একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর আবার ভাবতে লাগলেন। নাঃ, ব্যাপারটা সুবিধের নয়। সমস্ত শুভ কাজেই তো অনোখী স্বামী খলিলানন্দের পরামর্শ নিয়ে করেন, তবে এবার সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হলো কেন?

চিন্তার একটা কারণ আছে। পাখোটিয়া বংশধরদের হাতে কলম উঠলে ব্যাপারটা যে কত ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে, সেটা কি আর কুলগুরু স্বামী খালিলানন্দ জানেন না? জানেন।

বহু বছর আগে একবার অনোখীর পিতা চিন্ত্রিমল মাত্র দোয়াতে কলম ডুবিয়েছিলেন। ব্যস্ আর কথা নেই, সারা দেশে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে সামাজিক পঞ্চায়েত প্রস্তাব পাশ করে পখোটিয়া বংশে লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজকাল দেশ স্বাধীন হয়েছে, ঐ সব পুরনো পঞ্চায়েত হুকুম কি আর চালু আছে? না, এর একটা বিহিত করার প্রয়োজন। পোশাক বদল

করে শিষ্য খট্টানন্দকে ডাকলেন। খট্টানন্দ এখনও পাকাপাকি শিষ্য হ'ননি, তার প্রবেশনারি পিরিয়ড চলছে।

—খট্টা, আমার টু-সিটরটা বের করতো ?

—কোথায় যাবেন স্যর ?

—হ্যাঁ, অনোখীর কাছে যাচ্ছি। ব্যাটার দেখছি দুর্মতি হয়েছে। কয়েদখানায় গিয়ে যতো সব আজেবাজে লোকের সঙ্গে মিশে আমার এতদিনের শিক্ষাকে ডোবাবে দেখছি।

—অনোখী কি করলে স্যর ?

—শুনছি লেখাপড়া করছে। ছিঃ ছিঃ কেলেঙ্কারী। আরে রামো ! লেখাপড়া তুই করবি কেন ? শয়তানের হাতে কলম আর চোরের হাতে সিঁধকাঠি, দুই-ই যে বিপজ্জনক। দেখি ব্যাটাকে বোঝাইগে।

স্বামী খলিলানন্দ বের হয়ে গেলেন।

সন্ধ্যা বেলা। নির্জন ঘরে বসে অনোখীলাল পখোটিয়া তাঁর আত্মজীবনী লিখছেন। লিখছেন বললে ভুল হবে, লিখতে বসেছেন বলাই শ্রেয়ঃ। অর্থাৎ লিখবার সমস্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত। এখন লিখতে শুরু করলেই হয়। দোয়াত, কালি, কলম, পেন্সিল, ব্লটিং পেপার, পিন, অভিধান, ঘড়ি, এবং এক গ্লাস—এক গ্লাস কী ?—সিদ্ধি। সিদ্ধি না খেয়ে অনোখী কোন কাজ করতে পারেন না। সিদ্ধিদাতা গণেশের সেবা যিনি আজীবন করেছেন, তিনি সিদ্ধি পান করবেন এতে আর আশ্চর্য কী আছে !

যাই হোক আজ অনোখীলাল লিখতে বসেছেন। তিনি দৃঢ়সংকল্প যে লেখাটা আজ শুরু করবেনই।

অনোখীলাল ভাবছেন যে কাকে নিয়ে তার কাহিনী শুরু করা যায়। বাইভী, ছকু, না শাদীলাল ? উঁহু, শাদীলালকে নিয়েই

তিনি তাঁর আত্মজীবনী শুরু করবেন। শাদীলাল তাঁর 'বচপনের' দোস্ত, তাঁর সমস্ত বাল্য-জীবনের কাহিনীও অনোখীর জানা আছে এবং সেগুলি একসঙ্গে করলে যে ব্যবসায়ী মহলে একটা ভূমিকম্প হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ছোটবেলা থেকেই শাদীলাল ছুচুন্দর ও অনোখীলালের মধ্যে হরিহর আত্মাভাব। লোকে শাদীকে পাঁচ নম্বর এবং অনোখীকে চার নম্বর বলে ডাকত। কারণ তারা দেখতে নাকি অনেকটা ফুটবলের মত ছিল। সোনার বোতাম, সিল্কের পাঞ্জাবি, ফাইন ধুতি, পাম্প স্যু পরে কানের মাকড়ী দুলাতে দুলাতে তারা যখন রামবাগান ও গোয়ার গোবিন্দপুরের খেলা দেখতে যেতো, তখন সমস্ত লোকের দৃষ্টিই তাদের দিকে থাকত।

—শাদীলাল জুয়াচোর।

—জুয়াচোর!

বানানটা কী রকম খটমট লাগছে যেন। বহুদিন তিনি বাঙলা দেশে রয়েছেন সত্য, কিন্তু এখন পর্যন্ত বাঙালীর ভাষা অতটা বুঝে উঠতে পারেন নি। নইলে অনর্থক তাঁরা বানান নিয়ে এত হৈ-হল্লা করবেন কেন। অনোখী ঠিক করলেন যে, এ ব্যাপারে শিউচরণের পরামর্শ নে'য়াই শ্রেয়ঃ।

শিউচরণ, 'জুয়াচোর' বানান কী আছে রে,—অনোখী জিজ্ঞেস করলেন। আজ কয়েকদিন হলো শিউচরণের আয়টা মন্দ হয়নি। তাই সে একটু আয়েস করছিল, কিন্তু অনোখীর ডাকে সে সজাগ। হয়ে উঠল।

জুয়াচোর বানান কী আছে রে, শিউচরণ?—অনোখী আবার প্রশ্ন করলেন।

শিউচরণ এবার একটু সমস্যায় পড়লেন, সম্প্রতি বাঙলা দেশে এত

জুয়াচোরের সৃষ্টি হয়েছে এখন কী আর পুরনো সেকেলে বানানে চলবে। এ ছাড়া শিউচরণ শুনেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ও বানানের হের-ফের করেছে। তাই জবাব দিল—এজ্ঞে, আগে তো 'র' দিয়ে সবাই বানান করতো। এখন তো পথেঘাটে কত জুয়াচোর। আমার মনে হয় ওটা 'ড়' দিয়েই করলেই চলবে।

—হাঁ, ওহি ঠিক আছে। সবকোই জুয়াচোড় কো শিখলাইয়ে দেবো জুয়াচোড়ী কেতো খরাব কম্ আছে। জুয়াচোড়……।

এমন সময় স্বামী খলিলানন্দ ঘরে ঢুকলেন। শুধু তার কাণে 'জুয়াচোর' শব্দটিই গেলো। উঃ! কী ভয়ঙ্কর লোকরে অনোখীলাল! এখন তাকেই জুয়াচোর বলছে। না, একে আর বিশ্বাস নেই। শঙ্কিত মনে স্বামী খলিলানন্দ ঘরে ঢুকলেন।

চিংড়িহাটার লুটিলুটি হালদার ঘরে বসে হিসেব করছিলেন। সমাজ সেবার উদ্দেশে তার এক লাখ টাকার প্রয়োজন। টাকাটা কি উপায়ে তিনি সংগ্রহ করবেন সেইটে তিনি ভাবছিলেন। চ্যারিটি শো করবেন? না, আজকাল আর চ্যারিটি শো করে লাভ নেই, কারণ একটা শো করে তিনি একবার পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠিয়েছিলেন এবং টাকাটা দি গ্রেট রিপাব্লিক ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন, কিন্তু তারপর—ব্যাঙ্ক পটোল তুললো। টাকাটা না লাগল তার ভোগে, না লাগল দেশসেবায়। এই সময়ে লুটিলুটির চিন্তায় বাধা দিলেন কুম্ভ।

"সর্বনাশ হয়ে গেলো লুটিলুটি, অনোখীলাল শুনছি নাকি আমাদের আত্মজীবনী লিখছে।"—কুম্ভের কণ্ঠে থাকে উৎকণ্ঠার সুর।

বেশ হলো। আমি তো ভেবেছি যে অনোখীর কাছ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা নেবো আমার সমাজসেবার জন্যে। তা বই'র 'প্রফিট'টা ভালই হবে,—লুটিলুটি বলে।

—লুটিলুটি, তুমি তো খালি লাভের দিকটাই দেখছ। কিন্তু লোকসানের দিকটাও একবার ভেবে দেখতে হয়। অনোখী যখন তোমার আমার কথা লিখবে, তখন কি হবে ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখেছ কি ? এই যে আমরা দুজনে দার্জিলিং-এ গিয়েছিলাম, ঐ যে সবুজ রংয়ের 'মন দে'য়া নে'য়া' শাড়ীটা তুমি পরছো, ওটা কার টাকায়, এগুলো যখন ছাপার অক্ষরে বেরুবে তখন ব্যাপারটা কি হবে ?

অনোখী এই সব কথা লিখবে নাকি ওর বইয়ে—লুটিলুটি জিজ্ঞাসা করিলেন।

—আলবাৎ লিখবে। আমি তো শুনেছি, তুমি যে সমাজসেবার নাম করে ছয় লাখ টাকা সংগ্রহ করেছিলে সেই নিয়ে ও একটা বিশেষ চাপ্টার লিখছে।

সত্যি বলছো ?—এবার লুটিলুটি সত্যিই চিন্তিত হয়েছেন বোঝা গেল।

—আলবাৎ লিখবে। আমি নিজের চোখে পড়ে এলুম যে অনোখী তোমার হ্যাট কলেকসনের কথা সবেমাত্র লিখতে শুরু করেছে।

—তবে উপায় ?

একটু হেসে কুম্ভ বললেন—হাঃ হাঃ! আমিও তো বলছি, উপায় কি। দ্যাখো লুটিলুটি, আমার মনে একটা আইডিয়া এসেছে। বলছিলুম কি, তুমি স্বামী খলিলানন্দকে নিয়ে গিয়ে ওকে পাকড়াও করো। ওকে বোঝাও যে আমরা সবাই একই সূতায় গাঁথা। অর্থাৎ আমাদের সম্বন্ধে ওকে কিছু লিখতে হলে ও ব্যাটাও যে ফেঁসে যাবে, এ আমি হলফ্ করে বলতে পারি।

একটু লুটিলুটি বলিলেন : আচ্ছা যদি আমাদের কথা না শোনে।

—নিশ্চয়ই শুনবে। তোমার মধুমাখা হাসি আর স্বামীজির আধ্যাত্মিক বাণী শুনে যে না ভোলে সে মানুষ এখনও জন্মায়নি।

আর যদি দেখতে পাও লোকটা বাগ মানছে না তা হলে শুধু বলো ঃ অনোখী, তোমার বাঁশ-বাগানের সব কীর্তিই আমার জানা আছে। দেখবে বশ হয়ে যাবে।

যাই দেখিগে, কি হয়। আবার স্বামী খলিলানন্দকে বাড়িতে পেলে হয়। লুটিলুটি হালদার অনোখীর বাড়িতে যাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন।

অনোখীর মুখে 'জুয়াচোর' কথাটি শুনে স্বামী খলিলানন্দ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আজ বহুদিন ধরে ব্যবসায়ী মহলে তার আনাগোনা। ব্যাঙ্ক উদ্ঘাটন থেকে লিকুইডেশন অবধি সমস্তই তারই পরামর্শে হয়ে থাকে। এ হেন ব্যক্তিকে যে কেউ 'জুয়াচোর' বলতে পারে এটা বিশ্বাস করা কি সম্ভব ?

কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় কি ? তিনি নিজের কাণে শুনেছেন তাহা অবিশ্বাস করবার যো নেই। অতএব শঙ্কিত মনে স্বামী খলিলানন্দ অনোখীর ঘরে ঢুকলেন।

আইয়ে, আইয়ে স্বামীজি। আপ্‌কো দেখিয়ে দিল বোহুত খুশ্‌ হলো—অনোখী স্বামীজিকে বললেন।

—তা বাবা, জেল থেকে কবে বেরুলে ? বেরিয়ে এসে একবার আমাদের খোঁজ খবরটি তো করতে হয় !

—সাধুবাবা, আমি এক বোহুত বড়া কামমে ফাঁসিয়েছি। হমার রিস্তাদার কিরতিবাস যো ছেলো, হমি ঐসা এক বড়া কম করিয়ে যাবো।

কিরতিবাস ? সে আবার কে ?—স্বামী খলিলানন্দ প্রশ্ন করলেন।
—রাম, রাম, সাধু বাবাজী, কিরতিবাস লিখিয়ে গেলো রামায়ণ। আপ্‌ উনেহেকো নাম ভুলিয়ে গেছেন ?

একটু হেসে স্বামী খলিলানন্দ বললেনঃ আরে রামচন্দোর! তুমি রামায়ণের কৃত্তিবাসের কথা বলছ, তা ওর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

—হমার রিস্তাদার আছে। একই বংশের। শুনিয়েছি কিরতিবাস বোহুত উমদা কাম কোরিয়েছে।

একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বামী খলিলানন্দ বললেনঃ তুমি ভুল শুনেছো অনোখী। তুমি তো কৃত্তিবাসের বংশধর নও, তুমি হচ্ছো শ্রীহনুমানজীর সাক্ষাৎ বংশধর।

তব্ তো আউর বঢ়িয়া আছে—অনোখী বললেন।

—উঁহু! শোন অনোখী, হনুমান লঙ্কা পুড়িয়েছিল। তারই বংশধরের হয়ে বই লিখে তুমি দেখছি বাঙলা দেশের সবাইকে পোড়াবে।

এ তো বঢ়িয়া 'সিডিশাস' বাত বোলছেন আপনি—অনোখী বলল।

—আমি বলছি অনোখী, এইসব বই-টই লিখো না। সাহিত্যের আসরে নেমে শুধু মাত্র কয়েকটা লোকের ভাত মারবে!

—জরুর লিখবো। শাদীকে আপ জানেন?

—শাদী ভদ্র বংশের। তোমার মত হনুমানের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই।

—ওহি ভুল জানেন আপনি সাধুবাবা। আপনি ভাবলেন পোয়সা হাতে আসলে আদমী ভী বদল হয়ে গেলো। একদম ঝুট বাত আছে। শাদীলালের বাত ছাড়িয়ে লিন। মামার পোয়সা চোরি কোরিয়ে বোহুত শরীফ আদমী বনিয়েছে। হমি চিনি শাদীলালকে বচপনসে। দশ সাল পহেলে হমি আউর শাদীলাল আপকো জেব কাটিয়ে তিন হাজার রুপেয়া······

কথাটা শেষ হবার আগেই স্বামী খলিলানন্দ বললেনঃ রেসকোর্সে আমার পকেট তোমরাই কেটেছিলে ?

—জরুর কাটিয়েছিলাম। শাদীলালের হাতে ছিলো কাঁইচি, আউর হমার হাতে ব্যাগ। আউর ওহি রুপেয়াসে রেসে পাঁচ হাজার রুপেয়া পেলাম। উসসে আপকো ভী পাঁনশো দিয়ে দিলাম।

কথাটা শুনে স্বামী খলিলানন্দের মাথা টলতে লাগল। তিন হাজার টাকা রেস ময়দান থেকে চুরি গিয়েছিল বলে তিনি কত আক্ষেপই না করেছিলেন। পূজা, জপ, তপ কত করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। কিন্তু আজ সমস্ত রহস্য জানা গেল।

—আমার টাকা তোমরাই চুরি করেছিলে !

—আলবাৎ কোরিয়েছিলাম। আউর সাথ সাথ লুটিলুটির ভ্যানিটি ব্যাগ খুলিয়ে লিয়ে নেকলেশ ভী লিয়েছিলাম—

তবে রে, আমার নেকলেশ তোরাই নিয়েছিলি ? আমি আরো ভেবেছিলাম বাইভি নিয়েছিল···বলতে বলতে লুটিলুটি ঘরে ঢুকলো।

জবাব দিল অনোখী। বললঃ চোরি তো করিয়েছিলো শাদীলাল। বেচিয়ে দিলাম হমি। বাজার মে দাম ভী বোহুত হোয়েছিলো। হমার কেতাবসে এহি মিথ্যা ভী লিখবো।

তুমি বলছো কী অনোখী ?—বিস্মিতকণ্ঠে স্বামী খলিলানন্দ প্রশ্ন করেনঃ

সাচমুচ্। হমার কেতাব পঢ়িয়ে দেখুন—অনোখী জবাব দেয়।

এবার লুটিলুটি শব্দ করে বললেনঃ বলো কি ! ওটা তো ঝুটো হার ! আমায় দিয়েছিল হরকরা চাটুয্যে। ওর তখন বড়ো দুর্দ্দিন যাচ্ছিল। আমায় দিয়ে বললঃ আমার প্রেমের নিদর্শন। বিষুভিয়স থেকে আগুনের ঝলক্ উঠলে বেরোয় লাভা, আমার হৃদয় থেকে প্রেমোদগীরণ হয়ে বেরুচ্ছে হার।

—উস্‌মে কী আছে। হমি তো ঝুটা চীজকো অসলী চীজ কহিয়ে বাজার মে ছোড়িয়ে দিলাম। শাদীলালের কাকা পকৌড়ীমল ছগনলাল—দো হাজার রুপেয়া মে হমার কাছ থেকে ওহি হার খরিদ করিয়ে নিলো। স্বামী খলিলানন্দ তখনও রেসকোর্সে তিন হাজার টাকা উধাও হবার শোক সম্বরণ করে প্রকৃতিস্থ হন নি। এবার হার বিক্রি হবার কথা শুনে অজ্ঞান হবার উপক্রম হলেন। শুধু করুণ স্বরে বললেন ঃ রাধামাধব, রাধামাধব! এ কি শোনালে তুমি।

কি হলো তোমার আবার।—লুটিলুটি স্বামী খলিলানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—বড়্‌ডো ব্যথা, লুটিলুটি।

—কোথায়? বুকে বুঝি?

—না লুটিলুটি। দাঁতে ব্যথা। বড়্‌ডো কন্‌কন্‌ করছে।

নিদারুণ শোক পেলে পর স্বামী খলিলানন্দের দাঁত কন্‌কন্‌ করে।

—কেন এমন হলো? এই দারুণ গ্রীষ্মে তোমার দাঁত ব্যথা?

—হবে না তো কী? ঐ যে হার বিক্রি······

—ঐ হারের সঙ্গে তোমার আবার কি সম্পর্ক?

—তুমি জানো না লুটিলুটি। দেড় বছর আগে পকৌড়ীমল আমার কাছে ঐ হার বিক্রি করেছিল। ভাবলাম ব্যাঙ্কে ক্যাশ টাকা রাখার কত বিপদ। কখন ব্যাঙ্ক উঠে যায়, তাই তো জুয়েলারীতে বন্ধ করে রাখার মতলব করে পকৌড়ীমলের কাছ থেকে চার হাজার টাকায়—

—চার হাজার রুপেয়া দিয়ে ওহি ঝুটা হার খরিদ করলেন? রামজী, হনুমান! ছনিয়া বোহুত আশ্‌চরিয়া জগহ আছে সাধুবাবা। ও হারকা দাম দশ রুপেয়া ভী না হোবে।

থাক্‌গে বাপু, এই সব পুরনো কথা ঝালিয়ে লাভ নেই।—লুটিলুটি বললেন। তারপর অনোখীকে উদ্দেশ্য করে বললেন—শুনছি তুমি নাকি আমাদের সব গোপন কথা বলে বেড়াচ্ছো।'

ও তো আত্‌মাচরিত আছে। বোহুত বঢ়িয়া কাহিনী। স্বামীজিকা বাত ভী উস্‌মে আছে।

'একটু জল'—করুণ আর্তনাদ করে স্বামী খলিলানন্দ বললেন।

এবার দৃঢ়কণ্ঠে লুটিলুটি বললেনঃ শোন অনোখী, ঐ সব হতচ্ছাড়া কাজ করো না। ছিঃ ছিঃ, শেষ পর্যন্ত আত্মচরিত লিখছো? বরং আমি বলি কী দেশনেতা হয়ে যাও। হরকরা চাটুয্যেকে চেনো তো। মস্ত বড় লীডর। তিনখানা গাড়ী, দুখানা বাড়ি আর বিলেতি ব্যাঙ্কে চেক কাটে। রোজই আমার কাছে আসে—কতো খাতির করে। তিন বছর আগে আমার বাড়িতে সকাল-বিকেল বসে থাকতো চা খাবার জন্যে। আমার তৈরী চা খেয়ে একদিন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়লো; সে সোজা গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের নিচে গিয়ে গরম বক্তৃতা দিলে আধুনিক কলকারখানা ও শ্রমিকের সম্বন্ধে। ব্যস্‌, আর যায় কোথায়? রাতারাতি নেতা হয়ে পড়লো। কাগজে লিখলো এমন প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা নাকি তারা এ যুগে শোনে নি। এখন সবাই কতো খাতির করে। সাহেব-সুহেবেরা ডিনার খাওয়ায়, সরকার দেয় ককটেল পার্টি। শ্রমিক ও মালিক দুপক্ষ থেকেই বেশ টাকা পায়।

—এ তো বড়ো কাম্‌ কোরিয়েছে হরকরা বাবু। এহি বিজনেসে কেতো কেপিটেল ছেলো?

—পাগল হয়েছো অনোখী। হরকরা একটি পয়সা ঢালেনি। স্রেফ্‌ সবাইকে ডালমুট, সিঙ্গাড়া আর রসগোল্লা খাইয়ে সব নেতা হয়ে গেলো। কাগজে একটা ছবি তিন পোজে ছয়দিনে বেরুলো।

লীডর বলে সরকার ওকে রিকগনাইজ করলো।

এবার স্বামী খলিলানন্দের বলবার পালা। বললেন—লুটিলুটি, আমার একটু হরকরা চাটুয্যের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। হরকরা নিশ্চয় ভূত ভবিষ্যৎ বিশ্বাস করে।

—পাগল হয়েছো। ও নিজেই তো একটা আস্ত ভূত। তাই তো বলি অনোখী, তুমি একজন দেশনেতা হয়ে যাও। এ বিজিনেসে পয়সাও আছে, নামও আছে। গদীতে বসতেও পারবে, বসাতেও পারবে।

—লুটিলুটি বোহুত অচ্ছী বাত বোলিয়েছে, স্বামীজী। নেতা হোলে পর বোহুত ফায়দা আছে।

জবাব দিলেন খলিলানন্দ। বললেন, ঠিক বলতে পারছি না হে! একটু ধ্যানস্থ হয়ে ভগবানের সঙ্গে ডিস্‌কস্‌ করে নেয়া দরকার। তা, আত্মজীবনী লেখার চাইতে এ কাজটা যে ভালো এ অবশ্যি ঠিক কথা। কারণ, একবার দেশনেতা হতে পারলে তোমার আত্মজীবনী কাগজওয়ালারাই এসে রোজ লিখবে। তা বাপু, একটা কথা তোমার আগেই বলে রাখছি। দেশনেতা হয়ে যদি কণ্ট্রাক্ট পাও, তা হলে আমায় একবার কনসাল্ট করো। প্রফিট হবে কিনা এটা আগেই বলে দিতে পারবো।

—লুটিলুটি, এতো সফেদ কাগজ, কলম, কালি খরিদ করিয়ে রাখলাম। উস্‌কো কী হোবে?

আরে বোকা, ওগুলো স্রেফ্ কালোবাজারে পাচার করে দেও। বাজার আক্রা হয়ে যাবে তুমি যদি দেশনতো হও, আর স্বামীজি তোমার কুলগুরু হন, আমি তোমার এডভাইজার হই, এ দেশের কতো উন্নতি হবে বলো তো?

—ঠিক বাত বোলিয়েছে লুটিলুটি। শিউচরণ, শুনিইহে যা।

হমার লেখাপড়ার সামান বাজারমে ডবল দামে ছোড়িয়ে দে। হমি কল্‌সে দেশনেতা হোইয়ে যাবো।

দুই

বিখ্যাত শেয়ার ব্রোকার ঝুটালাল লুটেরমল টেলিফোন করছিলেন।

ঃ হ্যালো মেমসাহেব হমায় লেক জিরো ফাইভ সেভেন টু ওয়ান দিন।

মিহিকণ্ঠে জবাব এলো ঃ 'নম্বার প্লীজ এগেইন।'

ঃ লেক জিরো ফাইভ সেভে টু ওয়ান—নম্বর চাহিয়ে।

টেলিফোন মেমসাহেব তখন দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'চক্রান্তজালে নারী' পড়ছিলেন। হঠাৎ ঝুটালাল লুটেরমলের কল আসায় তার পড়ায় বিঘ্ন ঘটলো। এক জটিল অধ্যায়ের মাঝখানে তিনি এসেছেন—রবার্ট ব্লেক সহকারী স্মিথকে সঙ্গে করে দস্যুর সন্ধানে বের হয়েছেন। একটু দেরী হলেই একটি অসহায় নারীর জীবন নাশ হতে পারে। মেমসাহেবের মনে হলো যে রবার্ট ব্লেক তারই সাহায্য কামনা করছেন। আর না! শয়তানটাকে তিনি ধরিয়ে দেবেন। কিন্তু ব্লেকের কণ্ঠস্বর যেন একটু অস্পষ্ট বলে মনে হলো। তাই একটু যাচাই করে নেবার উদ্দেশ্যে মেমসাহেব আবার প্রশ্ন করলেন ঃ কী বললেন ব্লেক, জিরো ফাইভ সেভেন টু ওয়ান ?

'নহা নহী, লেক জিরো ফাইভ সেভেন টু ওয়ান।' বাঃ রবার্ট ব্লেক তো বেশ চমৎকার বাংলা বলে। হবে তা, দীনু রায়ের পাল্লায় পড়েছে যে!

ঃ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, ব্লেক ফাইভ সেভেন টু ওয়ান।

ঝুটালাল প্রতিবাদ করতে গেলো। কিন্তু ততোক্ষণে কনেকশন হয়ে গেছে।

টেলিফোন মেমসাহেব 'ট্যাপ' করে কথা শুনতে লাগলেন।

এক নম্বর যেন অন্য কাউকে বলছে।

ঃ হ্যাঁ, তা কী বল্লি, পাঁচমিনিটের মধ্যেই মরে গেলো?

ঃ পাঁচ মিনিটও নয়। অপর প্রান্ত হতে জবাব আসে।

ঃ বলিস কি রে? তা টাকা পয়সা—

ঃ কিস্‌সু রেখে যায় নি। সিন্দুক খুলে দেখি কী জানিস। তুটো বোগাস কোম্পানীর শেয়ার রেখে গেছে।—'দি সুন্দরবন অয়েল কোম্পানী' ও 'দি সেভেন্থ হেভেন এয়ারওয়েজ কোম্পানীর।'

ঃ এরে বাবা! তুই দেখছি একেবারে এয়ারওয়েজ কোম্পানীর মালিক হয়ে গেলি। তা এবার একটু চড়া দামে এয়ারওয়েজ কোম্পানীর শেয়ারগুলো বাজারে ছেড়ে দে।"

ঃ তুই পাগলা হলি। এই সব রদ্দি কোম্পানীর শেয়ার কেউ কিনবে! কোম্পানীরই অস্তিত্ব নেই—তার আবার শেয়ার।

ঃ হাজার হোক এয়ারওয়েজ কোম্পানীর শেয়ার তো রে। আর তুই হলি গিয়ে কিনা ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আচ্ছা, অনোখীলাল পখোটিয়ার নাম শুনেছিস?

ঃ হ্যাঁ ঐ ব্ল্যাক মার্কেটের রাজা অনোখীলাল পখোটিয়া তো। তা ওকে আবার কী জন্যে।

ব্যস্‌, এই পর্যন্তই। টেলিফোন মেমসাহেব এক করুণ আর্তনাদ করে উঠলেন। আর সেই আর্তনাদ গেলো টেলিফোন ক্লার্ক-ইন-চর্জ মাতঙ্গিনী দেবীর কাছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এই কালো ভ্রমর, তোর আবার কী হলো?

টেলিফোন মেমসাহেবের আসল নাম ছিল ভ্রমর। নীহারগুপ্তের 'কালো ভ্রমর' পড়ে নিজের নাম পাল্টে কালো ভ্রমর রেখেছিলেন।

কালো ভ্রমর জবাব দিলো ঃ মাতুদি, দুটো গুণ্ডা একটা বুড়োকে খুন করে তার সমস্ত টাকা পয়সা সিন্দুক থেকে খুলে নিচ্ছে। 'বডিটা' নিয়ে কি করবে তাই নিয়ে জটলা করছে।

ঃ স্বপ্ন দেখছিস্। যতো সব হেঁজিপেজি বই পড়ে তোর মাথাটা একদম গুলিয়ে গেছে দেখছি।

ঃ বেশ আমার কথা বিশ্বাস না হয় নিজের কানেই সব শুনে ছাখো না।

কালো ভ্রমর হেড ফোনটা মাতঙ্গিনী দেবীকে দিলো। মাতঙ্গিনী দেবী শুনতে লাগলেন।

এক নম্বর দুই নম্বরকে বলছে।

ঃ শোন্, আমি বলি কী অনোখীলাল পখোটিয়ার কাছে যা। আমি জোর গলায় বলতে পারি ও তোর শেয়ার চড়া দামে কিনে নিবে।

ঃ তুই ঠিক জানিস? দুই নম্বর প্রশ্ন করে।

ঃ আলবাৎ কিনবে। 'আকাশ কুসুম' কটন মিলের নাম শুনেছিস তো। ঐ মিলে একটা তাঁতও ছিল না। কিন্তু হলে হবে কী? 'আকাশ কুসুমের' ডেফারড্ শেয়ার কেনবার জন্যে লোকে কতো চুলোচুলি করেছে জানিস? ঐ শেয়ারের দাম হয়েছিল শেষ অবধি ছ শ টাকা।

ঃ বলিস কীরে? মিলে একটা তাঁত নেই কিন্তু তবু শেয়ারের দাম ছ শ অবধি উঠেছিল।

ঃ হবে না বাবা। বিজনেস ইজ বিজনেস।

চুপ করে ঝুটালাল লুটেরমল এই কথাবার্তা শুনছিলেন। এ

পর্যন্ত একটা শব্দও উচ্চারণ করেন নি, কিন্তু 'আকাশ কুসুমের' নাম শোনা মাত্র আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। মুখ থেকে দুটো শব্দ বেরিয়ে গেলো : 'রাম রাম'।

এক নম্বর দুই নম্বরকে জিজ্ঞেস করলে : এই, রাম নাম করছিস কেন রে? ভয় পেয়েছিস বুঝি।

: বাঃ রে, আমি আবার রাম নাম কখন করলুম।

: তা হলে নিশ্চয় কেউ······

এবার মাতঙ্গিনী দেবীর বলবার পালা।

তার বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না যে লোকটা সদ্য মাত্র খুন হয়েছে, এই রাম নাম তিনিই উচ্চারণ করেছেন। কারণ মাতঙ্গিনী দেবী জানতেন যে লোক খুন হলেই সাধারণতঃ রাম নাম বা ঐধরণের কিছু বলা হয়ে থাকে। তার মাথা টলতে লাগলো।

: ঠিক বলেছিস কালো ভ্রমর। ভূত কথা বলছে। এই মাত্র রাম নাম করলে।

: ভূত!

সমস্ত টেলিফোন মেমসাহেবগণ একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন।

: হ্যাঁ, ভূত। এই মাত্র নাকিস্বুরে রাম নাম করলে।

এই কথা বলার পরই মাতঙ্গিনী দেবী জ্ঞান হারালেন। সমস্ত সুইচ রুমে একটা গুঞ্জন উঠলো। : ওমা, মাতুদির ফিট হয়েছে। মাতঙ্গিনী-দি অজ্ঞান হয়েছে। এই মনোহারিণী, যা না ট্রাফিক সুপারকে খবর দে' গে। 'না বাপু আমার যেতে ভয় করছে। ঐ রাম নাম করা ভূতটা নিশ্চয় সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।' টেলিফোন মেমসাহেবগণ তাঁদের সিট ছেড়ে এসে মাতঙ্গিনী দেবীর

শুশ্রূষা করতে লাগলেন। কেউ বা দেয় বাতাস কেউ বা জল। এর মধ্যে সুইচ বোর্ডের বহু আলো জ্বলে উঠেছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 'সাবসক্রাইবারের' ঘনঘন কল আসছে। সবাই নম্বর চাইছে। 'হ্যালো অপারেটার, গিভ মী রাধাবাজার সিক্স জিরো ওয়ান ফাইভ। হ্যালো, গিভ মী জয়দবপুর লাইন টু থ্রি ওয়ান। হ্যালো মিস, জবাব দিচ্ছেন না কেন? সত্যিই আজকাল টেলিফোন সিস্টেম কী রাবিশ হয়েছে। হ্যালো আমায় সুপারভাইজারকে দিন তো। না, জ্বালালে দেখছি। একদম চুপ-চাপ, একটি রা পর্যন্ত নেই। হ্যালো মিস্ ··দাঁড়ান মজা দেখাচ্ছি! গুলবার্তায় লেটারস টু দি এডিটারে একটা লম্বা চিঠি ঝাড়তে হবে। হোপলেস্ মশায়, এই তো সেদিন ধাপ্পা সমাচার এদের নিয়ে কী জোরালো সম্পাদকীয়টাই না লিখলে। তবু এদের শিক্ষে হলো না। নাঃ নাঃ, এবার দেখছি 'লোকসভায়' একটা কোশ্চেন করাতে হবে।'

এক নম্বর দুই নম্বরে তখনো কথা বলছে।

ঃ শোন সত্য, তোর দাদু যে তোকে এমনি ভাবে পথে বসিয়ে যাবে এ আমি কল্পনা করিনি।

ঃ ভেবে কী হবে বলো। এখন দিন গুজরানের জন্যে কিছু একটা করতে হবে। আমার অবশ্য অনেক আগে থেকেই বোঝা উচিত ছিল যে দাদুর আর বেশী দিন নাই। অসুখে তো আর কম ভোগটা ভুগলেন না।

ঃ যাকৃগে, এখন ঐ 'সেভেন্থ হেভেনের' একটা হিল্লে কর। শোন, অনোখীকে গিয়ে পাকড়াও কর।

ঃ কিনবে তো ঐ ব্যাটা শেয়ার। শুনেছ লোকটা নাকি আস্ত ঘুঘু।

ঃ আলবাৎ কিনবে। যদি কেনে তা হলে অক্কা পেলে পর 'হেভেনে' যাবার সুযোগ পাবে, নইলে তো নরক বাস, এই কথাটা যদি ওকে বুঝিয়ে দিতে পারিস, তা হলে দেখিস এই কোম্পানীর শেয়ারগুলো কী চড়া দামে বিক্রি হয়। আচ্ছা, শোন্, তোর বাড়ির নম্বরটা কী রে? একদিন এসে ছুজনায় মিলে এ ব্যাপারটা নিয়ে ডিস্কস্ করা যাবে।

ঃ ছয় বাই সাত বাই ওয়ান-ফোর্থ আজগুবিপুর রোড।

ঃ এরে বাবা, এতো আচ্ছা বাড়ির নম্বর দেখছি রে। বাড়ির নম্বর আবার কখনও ওয়ান-ফোর্থ হয়?

ঃ আমি যে বাড়িতে থাকি সেখানে সবই হয়। মায় ডেসিমেল পয়েণ্ট অবধি এখানে আছে। আচ্ছা, শোন···হ্যালো, মিস্—হ্যালো ···এই যা নম্বর কেটে দিয়েছে"।

ছকুর কাছে টেলিফোন করবার মতলব নিয়েই ঝুটালাল লুটেরমল নম্বর চেয়েছিলেন কিন্তু 'ক্রস কনেকশনে' যে কথাবার্তা শুনতে পেলেন, তা শুনে তার চক্ষুস্থির হয়ে গেলো।

আকাশ কুসুমের সমস্ত ঘটনাই তার বিলক্ষণ জানা আছে। কারণ ঐ কোম্পানীর সমস্ত শেয়ারই তাঁরই মারফত লেনদেন হয়েছে। একথা ঠিক বটে যে 'আকাশ কুসুমের' তাঁত কোনদিনই বসানো হয়নি কিন্তু কোম্পানীর একটা সাইন বোর্ড ছিল বটে। কিন্তু 'সেভেন্থ হেভেন' কী রকম বিদঘুটে কোম্পানী রে বাবা। একটা সাইন বোর্ডও নেই। বহুদিন ধরে তিনি কোম্পানীর শেয়ারের কারবার করছেন—কিন্তু সেভেন্থ হেভেনের মতো বিটকেল নাম কখনও শোনেন নি।

এমন সময় তার চিন্তায় বাধা দিলেন ছকু ভাসু।

: এই যে ঝুটালাল, তোমার আক্কেলটা কী শুনি। আজ বাদে কালই আমার ডাইরেক্টর বোর্ডের মিটিং, আর তুমি কিনা আমার শেয়ারগুলোর কোন হিল্লে করতে পারলে না।

: কুন শেয়ারের বাত বোলিয়েছেন ছকুবাবু।

: আরে রসো, ঐ যে কী নাম বলে কিনা, 'মাসরুম ভেজিটেবিল' কোম্পানী।

: সবকৌই শেয়ার বেচহিয়ে দেবেন। বঢ়ী তাজ্জব কী বাত আছে।

: হ্যাঁ, বেচবো না তো কী। তারপর শেয়ার হোল্ডারের মিটিং-এ উপস্থিত থেকে যতোসব ঝক্কি সামলাই আর কী! বুঝলে ঝুটালাল, আমি আর ঐ সব 'মাসরুমের' ভেতর নেই। কোম্পানীর অংশীদারেরা যখন শুনতে পাবে যে কোম্পানীর সব ভেজিটেবলই গরুতে খেয়ে গেছে—তখন কী উত্তর দিবো বলতে পারো! না, না, ঝুটালাল তুমি আমার শেয়ারগুলো আজই বিক্রি করে দাও।

: আরে আপ কী বাত বোলিয়েছেন ছকুবাবু। গাই আপকো সবকোই ভেজিটেবেল খাইয়ে গেলো।

মুখ ভেংচি কেটে ছকু জবাব দেয়, তা না হলে কী আমি খেয়েছি ঝুটালাল। আচ্ছা, আজকাল তোমার কী হয়েছে বলো তো। কোন বড়ো কোম্পানীর শেয়ার ঢেঁয়ার বাগিয়েছো বুঝি! নইলে এতো চঞ্চল দেখছি কেন?

গলার স্বর নামিয়ে ঝুটালাল বললো, ছকু বাবু, সেভেন্থ হেভেন এয়ারওয়েজ কোম্পানীর নাম শুনিয়েছেন?

: ওরে বাবা! এ আবার কী—ছকু প্রশ্ন করে।

: হাওয়াই জাহাজ কা কোম্পানী। আরে আমার কাছে খোবর আসিছে যে অনোখীলাল এহি কোম্পানীকা সব কৌই শেয়ার খরিদ কোরিয়ে লিবে।

ঃ তুমি বলো কী ঝুটালাল। 'সেভেন্থ হেভেন'-এর শেয়ার কিনছে অনোখীলাল। না, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে বটে। তুমি ঠিক জানো?

ঃ ছকু বাবু এহি বিলকুল সাচ বাত আছে। হমি খুদ কানে শুনিয়েছি।

ঃ বড়ো চিন্তার ব্যাপার ঝুটালাল। 'ইট মাস্ট বী এ বিগ কোম্পানী। নইলে অনোখী এর শেয়ার কিনতো না। আচ্ছা ঝুটালাল, তুলি বলতে পারো অনোখীর মতলবটা কী।

ঃ আপ বেফিক্র রোহিয়ে যান, ছকু বাবু। হমি জানি কোম্পানীর ভিতর কুছু ভী না আছে।

ঃ য়্যাদ্দিন ছিল না বটে ঝুটালাল, কিন্তু এবার হবে। 'উদাস মাঠ' কোলমাইনের কথা তোমার মনে আছে? দশ বছরের মধ্যে কয়লা তো দূরের কথা, এমন কি ঘাসও দেখা গেল না। কিন্তু ঐ কোম্পানী দিয়ে অনোখী কতো লাভ করেছিল! আমি তোমায় হলপ করে বলতে পারি যদি অনোখী সেভেন্থ হেভেনের শেয়ার কেনে তা হলে কোম্পানী ধা ধা করে উঠে যাবে।

ঃ আরে, হমভী ওহি বাত বলছি ছকু বাবু। কোম্পানী জোরুর উঠিয়ে যাবে।

ঃ আরে না না ঝুটালাল, আমি কোম্পানীর লাটে উঠার কথা বলছি না। আমি বলছি কোম্পানীর বরাত এবার খুললো বটে।

ঃ আপ কী বাত বোলছেন ছকু বাবু—বিস্মিত কণ্ঠে ঝুটালাল প্রশ্ন করলো।

ঃ হ্যাঁ ঝুটালাল, ঠিকই বলছি। কোম্পানীর নামটার দিকে একবার নজর দিয়েছো! এই যে সব এয়ারওয়েজ কোম্পানী

আমাদের 'ফার্ষ্ট হেভেনে' নিয়ে যাচ্ছে তাদের শেয়ার বাজারে কী চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। আর এ কোম্পানীর নাম কি না, সেভেন্থ হেভেন—ওরে বাবা।

ঃ আপ সাচ্‌মুচ্‌ বোলছেন যে সেভেন্থ হেভেন বঢ়িয়া কোম্পানী আছে ?

ঃ বঢ়িয়া মানে, একদম গোল্ড মাইন। এর তুলনায় অন্য সব কোম্পানী তো কপার মাইন হে। সত্যি ঝুটালাল তোমার বুদ্ধি দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। কী করে যে ব্যবসা চালাও আমি ভেবেই পাইনে।

ছকুর মুখে নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা শুনে ঝুটালাল একটু লজ্জা পেলো। তাই জবাব দিলো ঃ ছকু বাবু আপ হমার বহুত উপকার কোরিয়ে গেলেন। হম আজই এহি কোম্পানীর সব কৌই শেয়ার খরিদ কোরিয়ে লিবো। দো রোজমে শেয়ার মার্কিট আগকা মাফিক গোরম হোইয়ে যাবে।

ঃ কিন্তু ঝুটালাল, ম্যানেজিং এজেন্সীর শেয়ার আমার। দেখো বাপু, আমার কথা কিন্তু ভুলে যেও না। আমি না বললে তো খেয়ালই করতে পারতে না যে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ আছে। আরে ঝুটালাল, এখনও বুঝতে পারছো না যে অনোখী ব্যাটা কেন এই কোম্পানীতে ঢুকতে চাইছে। আজ বাদে কাল ব্যাটা দেশনেতা হবে। সরকারের কাছে দহরম মহরম হবে। এবার দুইয়ে-দুইয়ে যোগ করে ত্থাখো,—দেখবে সব মিলে যাবে। আর একটা কথা, এই কোম্পানীর প্লেন যখন আমেরিকায় যাবে তখন কী হবে বলতে পারো।

ঃ কী হোবে ?

ঃ সেভেন্থ হেভেনে যাবার জন্যে সবাই কিউ করে দাঁড়াবে

ঃ আভি সবকুছু সমঝিয়ে লিলাম, ছকু বাবু। আপ ঠিক বোলিয়েছেন যে সেভেন্থ হেভেন বঢ়িয়া কোম্পানী হোবে।

ঃ কিন্তু ভায়া ভুলো না, সেভেন্থ হেভেনের ম্যানেজিং এজেন্সীর শেয়ার আমার।

ছকু ভাস্ু চলে গেলেন।

পরদিন বাইভির বাড়িতে ঝুটালাল এসে হাজির।

ঃ রাম, রাম বাইভি সাহব।

ঃ হোয়াট ইজ দি ম্যাটার, ঝুটো।

ঃ সব খোবর শুনিয়েছেন ?

ঃ কোন নিউজ ?

একটু ওদিক তাকিয়ে ঝুটালাল বললো ঃ বাইভি সাহব, সেভেন্থ হেভেন কোম্পানীর নাম শুনিয়েছেন ?

ঃ গুড্ লর্ড, এয়ারওয়াজ কোম্পানীর নাম সেভেন্থ হেভেন। তোমরা 'মুনে' যাবার চেষ্টা করছো না তো।

ঃ নহী-নহী বাইভি বাবু। কল্ সুবহ কো হমার খোবর মিলিছে যে এহি কোম্পানী বোহুত বঢ়িয়া কোম্পানী আছে। ছকু বাবু স্রিফ্ হমায় কেতো বোললো, ঝুটালাল পঁচাশ হজার রুপেয়ামে ম্যানিজিং এজেন্সীর শেয়ার হমার বেচিয়ে দাও। হমি জবাব দিলাম, নহী ছকু বাবু। বাইভি সাহব হমায় বোহুত পুরানো দোস্ত আছে। শেয়ার বেচতে হয় তো উনহেকো দেবো। তো ছকু বাবু হমে কী বোললো জানেন ? বললো, ঝুটালাল বাইভি শালা ফোরটুয়েন্টি আছে। শেয়ার খরিদ কোরিয়ে পোয়সা দেবে না।

ঃ ছকু এই কথা বলেছে। বাইভি একটু উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করে।

ঃ জোরুর বোলেছে। আপনা কানে শুনিয়েছি। সেভেন্থ হেভেনের শেয়ারের লিয়ে হমে কেতো বললে, তারপর একটু ঢোক

গিলে ঝুটালাল বললো, বাইভি সাহব সেভেন্থ হেভেনের শেয়ার আপনি সবকুছু খরিদ কোরিয়ে লিন! ছকুবাবু পঁচাশ হাজার দেবে বলেছে, আপ একলাখ দিয়ে দিন, আপকো সবকুছু দিয়ে দেবো।"

ঃ একলাখ! বলো কী হে ঝুটালাল।

ঃ হ্যাঁ, বাইভি সাহব, এইসা বঢ়িয়া কোম্পানী কভি না মিলবে। বাজারমে আভি শেয়ার ছোড়িয়ে দিলে কেতো হোবে জানেন, স্রিফ্ ঢাই লাখ।

ঃ কিন্তু এক লাখ যে বড্ডো বেশী টাকা হে। একটু কমসম হয় না।

ঃ রুপেয়া আপ খুদ থোড়াই দেবেন। আরে বাইভি সাহব, মেডিটারনিয়ান বেঙ্কসে এডভ্যান্স লিয়ে লিন। সেভেন্থ হেভেন ভী আপকো হোইয়ে গেলো, মেডটারনিয়ান ভী আপকো রহিয়ে গেলো। ইস্‌কা বাদ আপ সবকোই জগহমে যেতে পারবেন—সেভেন্থ হেভেন ভী মেডিটারনিয়ান ভী।

ঃ নো, নো, সে কথা বলছিনে ঝুটো। আসল ব্যাপারটা কী জানো, আণ্ডার-কারেণ্ট ইলেকট্রিক কোম্পানীর নাম দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে যে টাকাটা এ্যাডভান্স নিয়েছিলাম, সেটা নিয়ে শেয়ার হোল্ডাররা বড্‌ডো হৈ-চৈ করছে। জিজ্ঞেস করছে সে আণ্ডার-কারেণ্ট কোম্পানীর কারেণ্টগুলো যায় কোথায়?

ঃ তবতো আউর ভী সুবিস্তা হোইয়ে গেলো। আভি বোলিয়ে দেবেন যে কারেণ্ট সবকোই সেভেন্থ হেভেনে যাচ্ছে।

সাহেব বাইভি কথাটা ভেবে দেখলেন। প্রস্তাবটা মন্দ দেয়নি ঝুটালাল। ইলেকট্রিক কোম্পানীর কারেণ্ট যদি 'সেভেন্থ হেভেনে' যায় তো কার কী? এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। আণ্ডার-কারেণ্টের নামটাও বর্তমানে আর শেয়ার হোল্ডারের মিটিং-এ

উঠবে না, আর সেভেন্থ হেভেন কোম্পানীর মালিক হওয়া যাবে।

ঃ ঠিক বলেছো, ঝুটালাল। তোমার আইডিয়াটাই গ্র্যাণ্ড, সেভেন্থ হেভেনের শেয়ার আমি এক লাখ টাকা দিয়েই কিনে নেবো।

হাসি মুখে ঝুটাকাল লুটেরমল বের হয়ে গেলেন।

ঃ আরে অনোখী, তু শুনলবা।

ঃ আরে কৌন বাত্ করছিস, ঝুটালাল। কী সমাচার আছে রে।

ঃ সেভেন্থ হেভেনের নাম শুনেছিস।

ঃ কোন্ চীজ ?

ঃ সেভেন্থ হেভেন।

ঃ কোন্ দাওয়াই আছে রে ঝুটালাল ?

ঃ দাওয়াই থোড়াই আছে। একদম সাচ্চা বঢ়িয়া হাওয়াই জাহাজকা কোম্পানী। ছকু বাবু আভি হম্‌কো কহিয়ে গেলো, ঝুটালাল এহি ডায়মণ্ড কা খনি আছে।

ঃ তব তো বঢ়িয়া কম্ করিয়ে লিলি ঝুটালাল, তা শেয়ারকা ভাও কেতো হলো ?

ঃ হমার কাছে ম্যানেজিং এজেন্সীর শেয়ার ভী আছে। ছকু বাবু এক লাখ দিতে রাজী—বাইভি সাহব দো লাখ—অনুখী তু হমার বচপন্‌কা দোস্ত আছিস। হমি তোকে ঢাই লাখমে এহি শেয়ার ছড়িয়ে দেবো।"

টেলিফোনে দুই বন্ধুতে কথা হচ্ছিলো।

ঝুটালালের কথা শুনে অনোখী একটু দ্বিধায় পড়লো। ব্যবসা থেকে অবসর নিয়ে তিনি আত্মাচরিত লেখার সংকল্পে ছিলেন, কিন্তু সে মতলবও তাঁর ভেস্তে গেছে। আজ ঝুটালালের লোভনীয় প্রস্তাব

শুনে ব্যবসাক্ষেত্রে আবার ফিরে আসবার শখটা চাড়া দিয়ে উঠলো। কিন্তু পয়সা কোথায়? তার একমাত্র ভরসা লুটিলুটি হালদার। অনোখীকে দেশনেতা করবার জন্যে লুটিলুটি কী আপ্রাণই না চেষ্টা করছে। বুদ্ধি পরামর্শ পাব্লিসিটি সব কিছুই লুটিলুটি বন্দোবস্ত করেছে। এ কয়েকদিনে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও বেশ হয়েছে। সেই সূত্রেই অনোখী জানতে পেরেছে যে গত তিনটা চ্যারিটি শো করে লুটিলুটি বেশ মোটা টাকা বানিয়েছে। এখন সে টাকা থেকে বেশ একটা ভারী অংশ পেলেই অনোখীর সমস্ত ভাবনা চুকে যায়। কিন্তু টাকাটা বাগানো যায় কী উপায়ে? হ্যাঁ, এবার মনে হয়েছে, আজ ক'দিন হলো অনোখী লক্ষ্য করেছে যে লুটিলুটি কয়েকটা নতুন গয়না বানিয়েছে। গয়নাগুলোর দাম বেশ একটু মোটা টাকাই হবে। যদি একবার ওগুলো হাতড়ানো যায়। শুধু গয়না নয়, ঝুটালালের শেয়ারগুলোও জলের দরে কিনতে হবে কিংবা হাতরাতে হবে।

কী করে সে সম্ভব...হ্যাঁ, ঠিক কথা। দেশনেতা হবার উপলক্ষে অনোখীলাল এক বিরাট যজ্ঞ করবে বলে স্থির করেছে। প্রস্তাবটা লুটিলুটি হালদারই দিয়েছে। কারণ লুটিলুটির ধারণা যে রাজ-নীতিক্ষেত্রে নামতে হলে দু একবার যজ্ঞ করতে হয়। লুটিলুটি বলেছে—'অনোখী, লোকে পলিটিশিয়ান হয়ে যজ্ঞ করে— আমি বলি কী তুমি যজ্ঞ করে পলিটিশিয়ান হও।' যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট প্রেস কনফারেন্স হবে এবং সেই কনফারেন্সে অনোখী তার দেশসেবার মোটামুটি একটা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবে। লুটিলুটি যজ্ঞের আগের দিন তার বাড়িতেই কাটাবে বলে ঠিক করেছে। অনোখীলালকে সেদিন রাত্রেই সব কিছু করতে হবে। উঃ একবার যদি এ মতলবটা শাদীলালকে জানানো যেতো। তার মনে আছে

সে ও শাদীলাল একবার প্ল্যান করে স্বামী খলিলানন্দের···যাক গে ঐ সব পুরনো কথা ভেবে কী হবে। ঝুটালালের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে বলতে অনোখীর এইসব কথা মনে হচ্ছিলো। ঝুটালাল তখনও টেলিফোনে হ্যালো, হ্যালো করছে। অনোখী এবার জবাব দিলো ঃ 'ঝুটালাল শুন্, একরোজ তু হমার মোকানে আসতে পারবি। হম্ দোনো বৈঠকে সবকুছু ফয়সালা কোরিয়ে লিবো, হ্যাঁ, শেয়ারতো আমি জোরুর খরিদ কোরিয়ে লিবে।

অনোখীর বাড়ি যাবার নেমন্তন্ন পেয়ে ঝুটালাল শিউরে ওঠে। বহুদিন আগে একবার অনোখীর বাড়ি গিয়ে তাকে কী মুশকিলেই না পড়তে হয়েছিল। ঝুটালালের সে কথা আজোও স্পষ্ট মনে আছে।

সে দিন ঝুটালাল গিয়েছিল অনোখীর বাড়িতে। বসবার সঙ্গে সঙ্গে অনোখী তাকে দিলো এক গ্লাস সিদ্ধি। এক-দুই-তিন··· তারপর ঝুটালালের মাথাটা যেন টলতে লাগলো। এমন সময় অনোখী তাকে জিজ্ঞেস করলো, ঝুটো খটখট জুট মিল্‌সের প্রেফারেন্স শেয়ারের দাম কেতো হোয়েছে?

খটখট জুট মিলসের প্রেফারেন্স শেয়ারের দাম তখন ছশ টাকা। কিন্তু সিদ্ধির এমনই গুণ যে মাত্র ছয়···কথাটা তার মুখ থেকে বেরুবামাত্র বাকী কথাগুলো একদম জড়িয়ে গেলো। 'শ' কথাটা আর বোঝা গেলো না। ব্যস্, আর যায় কোথায়? শেয়ার মার্কেটের অন্যতম রাজা রামগিধোর শিউকিষেন সামনেই বসে ছিলেন। তাঁর কাছে খটখট জুট মিলসের কিছু শেয়ার ছিলো। জুট মিলসের শেয়ারের দাম যে এতো পড়তি হয়েছে এটা তাঁর জানা ছিলো না। অল্প দামে তিনি এই শেয়ার বহু কিনেছিলেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে শেয়ারের দাম একদিন হাজার টাকা হবেই। কিন্তু এ কী নিদারুণ কথা তাঁকে শুনতে হলো। ছয় শ টাকার

শেয়ার মাত্র ছয় টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে, কৈ তিনি তো কিছু জানেন না! অন্ততঃ ঝুটালালের মুখ দিয়ে যখন এ কথা বেরিয়েছে তখন শেয়ারের দাম পড়তে বাধ্য। কারণ ঝুটালাল তো শেয়ার মার্কেটের একচ্ছত্র অধিপতি। রামগিধোঁর গোপনে টেলিফোন করে জানতে পারলেন যে শেয়ারের দাম তখনও পড়েনি। সময় থাকতেই সব বেচে দেওয়া উচিত। নইলে কখন কী হয় বলা তো যায় না। ঝুটালাল যখন শেয়ারের দাম কমিয়েছে, তখন আজ না হয় কাল এর দাম কমবেই। রামগিধোঁর তার সমস্ত শেয়ার বেচে দিলেন। সমস্ত শেয়ার মার্কেটে জানাজানি হয়ে গেলো যে ঝুটালাল ও রামগিধোঁর খটখট জুট মিলের শেয়ার বেচে দিচ্ছেন। ব্যস্, আর যায় কোথায়! চুনোপুটিরাও তাদের শেয়ার বেচে দিলেন। ঝুটালালের সিদ্ধির নেশা যখন ভাঙ্গলো তখন কোম্পানীর শেয়ারের দাম মাত্র ছয় টাকায় দাঁড়িয়েছে।

খটখট জুট মিলসের চেয়্যারম্যান তখন শাদীলাল ছুচন্দর, কোম্পানীর এই 'ক্রাইসিস' আসার আগেই তিনি ঝংকারিণী দেবীকে নিয়ে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ সেখানে টাকার টান পড়লো। 'ডাইরেক্টর ইন চার্জ' বাইভিকে টেলিগ্রাম পাঠালেন—Send, Money Immediately. কিন্তু এর মধ্যেই মিলের 'ক্রাইসিস' শুরু হয়ে গেছে। অতএব বাইভি জবাব দিলেন—No Money. কিন্তু টেলিগ্রাম মাস্টার ভুল বুঝলেন। তারা খবর দিলেন, No Honey.

টেলিগ্রাম পড়ে তো শাদীলালের চক্ষুস্থির, তিনি চাইলেন টাকা, আর জবাব এলো কিনা 'নো হানি।' না বাইভির একদম বুদ্ধি নেই। তাই আবার 'তার' পাঠালেন: Not Honey but Money.

ইতিমধ্যে শেয়ারের দাম এসে চার টাকায় দাঁড়িয়েছে।

কোম্পানীর লাল বাতি প্রায় জ্বলেজ্বলে। বাইভি অনেক ভেবে চিন্তে জবাব দিলেন: Yes, No Money Stop Red Light Before Company.

এবারের টেলিগ্রাম পড়েও শাদীলাল কিছুই বুঝতে পারলেন না। উঃ বাইভিটা ভালো ইংরাজী জানে বলে তাদের কী নাস্তানাবুদই না করছে। এ রকম খটনট ইংরাজী লেখার কোন মানে হয়?

'শাদীলাল টেলিগ্রামটা আবার পড়লেন।' Red Light Before Company' এর মানে কি রে বাবা!

ঝংকারিণীকে শাদীলাল টেলিগ্রামটা দেখালেন। একগাল হেসে ঝংকারিণী বললেন, বিভু লিখেছে তো। তা হলেই হলো। ও নিশ্চয় কোন 'কোড' শব্দ ব্যবহার করেছে। দিনরাত তো ও 'ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল' ক'রে, নিশ্চয়ই ওর একটা শব্দ লাগিয়েছে।

তা হোলে কী হোবে—শাদীলাল প্রশ্ন করে।

'কোড' শব্দের মানে টেলিগ্রাম করতে বলে দাও—ঝংকারিণী বললেন।

অতএব শাদীলাল আবার 'তার' পাঠালেন—Can not Understand Stop Send Quote Key Unquote Stop. তার যথাসময়েই বাইভির কাছে গেলো। কিন্তু টেলিগ্রাফ অফিসে তখন পুলিসের স্পাই পটাশ নন্দী বসেছিলেন, ব্যস্, এই টেলিগ্রাম পড়ে তাঁর বুঝতে একটুও অসুবিধা হলো না যে বাইভি ও শাদীলালের মধ্যে একটা গোপন অভিসন্ধি চলছে। নইলে শাদীলাল বাইভিকে চাবি পাঠাতে বলবে কেন। এতক্ষণে তাঁর কাছে আহ্লাদপুরের সিন্দুক ভাঙ্গার কেসটা জলের মতো সরল হয়ে গেলো। তিনি বুঝতে পারলেন যে শাদীলাল যে চাবি পাঠিয়েছেন ওটা নিশ্চয় কোন 'মাস্টার কী' যা দিয়ে যে কোন সিন্দুক খোলা

যায়। শাদীলাল এবার কাশ্মীরে নিশ্চয় কোন সিন্দুক ভাঙ্গবার ফিকিরে আছে।

টেলিগ্রাম পেয়ে পটাশ আর দেরি করলেন না। কর্তার কাছে চলে গেলেন। কর্তা তখন আগাথাক্রিষ্টির হারকুল পয়রেটের এক চমকপ্রদ কাহিনী পড়ছিলেন। পুলিশ ইনস্‌পেক্টরের গাফিলতিতে পয়রেটরকে কী মুশকিলেই না পড়তে হয়েছিল। পটাশের কথা শুনে তিনি বুঝতে পারলেন যে পুলিশ ইনস্‌পেক্টরের মতো যদি তিনিও ভুল করেন, তা হলে হয়তো একটা বিরাট কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। তাই হুকুম দিলেন— 'য়্যারেষ্ট। লেট আস টেক প্রিকশন বিফোর দে য়্যাক্ট।' কলকাতায় বাইভি ও কাশ্মীরে শাদীলাল গ্রেপ্তার হলেন। সমস্ত শহরময় ছড়িয়ে গেল খটখট জুট মিলসের টাকা তছরূপ করবার অভিযোগে চেয়ারম্যান শাদীলাল ও ডিরেক্টর বাইভিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই কেস হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে শাদীলাল ও বাইভিকে যে কতো বেগ পেতে হয়েছিলো সেটা ব্যবসায়ী মহলে সবাই জানেন।

এই সমস্ত বিভ্রাটের মূলেই ছিলেন অনোখীলাল। যদি ঝুটাল্যালকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে সিদ্ধি না পান করাতেন তা হলে এ সব গোলমাল হতো না।

আজ আবার অনোখীর বাড়িতে যাবার নেমন্তন্ন পেয়ে ঝুটালালের সেইসব পুরানো কথা মনে হলো। তাঁর ভয় হলো যে এবার অনোখী হয়তো আবার তাঁকে সিদ্ধি খাইয়ে আর একটা বিভ্রাট করে তুলবে। কিন্তু উপায় নেই। অনোখীলালের কথায় স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে কোম্পানীর শেয়ার সে কিনবেই। আড়াই লাখ টাকায় শেয়ার বিক্রি করাটা সহজ ব্যাপার নয়। আর এ অনোখী দেশনেতা শিগ্‌গিরই হবে। তখন তো তাকে রোজই একবার অনোখীর বাড়িতে যেতে হবে।

কম্পিতকণ্ঠে ঝুটালাল এবার জবাবে বলে : হ্যাঁ, অনোখী হাম জোরুর তুমসে মোলাকাত করবো।

—এক মেবী বাত শুনিয়ে লে, ঝুটালাল। এক মাহিনা বাদ মোর জনম তিথি হোইবে। উসকে বাদ হমি বঢ়িয়া এক যজ্ঞ করবো। আউর সাথ সাথ হোবে প্রেস কনফারেন্স। দেশনেতা হোইয়ে যাবো। দেখিয়ে দেবো সব কোই শালাকে কেতো চালে কেতো ধান। এক রোজ পহেলে তু মোর মকান আসবি। হম দোনো ঠিক কোরিয়ে লিবো সেভেন্থ হেভেন কোম্পানীর সবকুছু।

নিতান্ত শঙ্কিত মন নিয়েই ঝুটালাল রাজী হয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে শেয়ারের বাজার গরম হয়ে উঠলো। হাত ঘুরে ঘুরে শেয়ারের দাম বাড়তে লাগলো। সত্যর কাছ থেকে ঝুটালাল সমস্ত শেয়ারই কিনে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ইচ্ছেমতো শেয়ারের দাম বাড়াতে লাগলেন।

কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন ভরে গেলো। অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ কোম্পানীর নাম শুনে লাফিয়ে উঠলেন,—"যাক্ য়্যাদ্দিনে তবু সগ্‌গে যাবার একটা হিল্লে হলো।"

প্রায় পনেরো দিন বাদে।

বাইভি ও ছকু উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিলো।

বাইভি বলে : আচ্ছা ছকু, ঝুটালালের কাণ্ডটা দেখলি। আমাদের কী বেল্লিকটাই না বানালে। আমাদের 'ওয়ার্ড' দিয়ে শেষ পর্যন্ত কিনা সমস্ত শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছে অনোখীর কাছে। ছিঃ ছিঃ স্ক্যাণ্ডালাস।

—যা বলেছিস বাইভি, ঝুটালাল আমাদের একদম 'লেভেল ক্রসিং' করলে।

ভুল ইংরেজী বা কোটেশন বাইভি সহ্য করতে পারে না। তাই বলে ঃ ছকু ওটা 'লেভেল ক্রসিং' নয়, ওটা হলো গিয়ে 'ডবল ক্রসিং'।

বাইভির ইংরাজী ছকুর বোধগম্য হয় না।

তাই বললে ঃ একই কথা বাইভি। আচ্ছা ঝুটালাল যে আমাদের সঙ্গে এই জোচ্চুরিটা করলে কোর্টে একটা নালিশ ঠুকে দিলে হয় না। দেখবি ব্যাটার তা হলে পুরো পাঁচটি বছর ঘানি টানতে হবে। দেবো নাকি—ছকুর কথা শেষ হবার আগেই বাইভি একটা করুণ আর্তনাদ করে উঠলো। বল্লে ঃ ভুলেও অমন কাজটি করিস নে ছকু। ঝুটালালকে বিশ্বেস নেই। কোর্টে দাঁড়িয়ে কী বলতে কী বলে আসবে তার ঠিক কী? তারপর আমাদের সবাইকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া হোক আর কী। জানিস তো স্ক্যাণ্ডাল টানতে গেলেই আরো স্ক্যাণ্ডাল বেরিয়ে আসবে।

—তা হলে একটা কিছু বিহিত কর। আমাদের মুখের গ্রাস এমনি ভাবে কেড়ে নেবে, এ আমার সহ্য হয় না। আচ্ছা, 'সেভেন্থ হেভেন'-এর শেয়ারগুলো তো অন্য কারো কাছেও বিক্রি করতে পারতো। কিন্তু অনোখীর কাছে বিক্রি করার মানে হচ্ছে আমাদের 'ইনসাল্ট' করা।

—ঠিক বলেছিস, বাইভি জবাব দেয়।

—আর ঐ শালার বুদ্ধিটাও দেখ। লোকের গলা কাটতে হয় একটু দেখে শুনে কাট। ঐ যে ইংরেজীতে কি একটা না কথা আছে ঃ Cut others throat according to your knife.

আবার ভুল ইংরেজী! বাইভি সহ্য করতে পারলো না।

তাই বল্লে ঃ আচ্ছা ছকু তোকে কতবার বলেছি যে ইংরেজী তুই ব্যবহার করিসনে। যা জানিসনে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ। ওটা হবে Cut your coat according to your cloth.

বাইভির কাছ থেকে বারবার ধমক খেয়ে ছকু একটু দমে গেলো। তাই একটু অনুযোগের কণ্ঠে বল্লেঃ শুধু তুই আমায় বকিস বাইভি। আজকাল কী আর কোট বানাবার যো আছে রে। তোর কটন মিল থেকে কোটের কাপড় তো সব 'ব্ল্যাকেই' পাচার করে দিলি। কোট কাটবার সুযোগ লোকে পেলো কখন।

বাইভি কথাটা পাল্টে নেবার চেষ্টা করলো। বললো : থাকগে ছকু, আমরা কিন্তু আমাদের সবজেক্ট থেকে ডিভিয়েট করছি। আচ্ছা শোন······

ঃ রাম রাম ছকুবাবু।

বলতে বলতে কটন মার্কেটের রাজা শাদীলাল ছুচুন্দর ঘরে ঢুকলো।

—আরে শাদীলাল দেখছি। যাক তোমায় পেয়ে ভালোই হলো। অনোখীর কাণ্ডখানা দেখলে ?

—এহি জোরুর শুনিয়েছি বাইভি বাবু। বঢ়ী খরাব বাত আছে। এহি বাত শুনিয়ে কেতো রোজসে আমার খানা ভী বন্‌ধ্‌ হোহিয়ে গেলো। তারপর ছকুর দিকে তাকিয়ে বললো ঃ আচ্ছা ছকুবাবু, অনোখীলাল সাচমুচ দেশনেতা হোইয়ে গেলো !

—হয়নি হে—হবে। তা এ আর নতুন খবর কি ? আমরা সবাই তো জানি যে অনোখী দেশনেতা হবার জন্যে বিরাট যজ্ঞ করছে। কিন্তু এর চাইতে মারাত্মক খবর শুনেছো কি। দি সেভেন্থ ······ছকুর কথায় শাদীলাল কান দিলো না। বরং বলতে লাগলো ······ছকুবাবু, দেশনেতা হোনেসে কেতো ফায়দা আছে, আপ থোড়াই জানেন।

ঃ আহা বড়ো জোর দু চারটে বেশী কন্ট্রাক্ট পাবে, এই আর কী······ছকু জবাব দেয়।

ঃ নহী জী, ইসমে আউর সুবিস্তা আছে। দেশনেতা হোইয়ে অনোখীলাল আপনা জনম তিথি বড়া ধুমধামসে কোরবে। আউর হমার কাছে খবর আসিছে কী দেশনেতার জনম তিথিমে—পঁচাশ হাজার, লাখ রূপেয়াকা তোড়া ভেট মিলবে—ছকু বাবু, আপ জানেন না, অনোখীলালকো এক জনম তিথিমে পঁচাশ হাজার লাখ রূপেয়া ভেট মিলবে—তো সালমে অনোখী শালা তিনবার আপনা জনম তিথি মানবে। দেড়লাখ রুপেয়া এক সালমে মুফৎ লিয়ে লিবে।

—গুড লর্ড ঃ বাইভি মন্তব্য করলে।

—রাধাকেষ্টো, রাধাকেষ্টো—ছকু বলে।

—হাঁ, হাঁ সাচ বাত বোলছি। এ কম্ তো অনোখীলাল জোরুর কোরবে। উসকো হমি বচ্‌পনসে জানি। বিনা কেপিটালে কেতো পয়সা কোরিয়ে লিবে, আপ দেখিয়ে লিন।

—তার মানে শাদীলাল তুমি বলতে চাও যে জন্মতিথিতে টাকার তোড়া প্রেজেণ্ট পাবার জন্যেই অনোখীলাল দেশনেতা হচ্ছে—বাইভি বলে।

—আলবাৎ, ইসি লিয়ে ওহি শালা ভেক্ ধরিয়েছে।

এবার ছকুর মন্তব্য করার পালা। সে বললো ঃ শাদীলাল ঠিকই বলেছে রে বাইভি। আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল যে অনোখীর দেশনেতা হবার পেছনে একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। নইলে হঠাৎ ব্যাটার এদিকে নজর গেলো কেন ?

—হ্যাঁ, এখন সবই বুঝতে পারছি। 'নাউ এভরিথিং ইজ ক্রিষ্টাল ক্লিয়ার' ঃ বাইভি বলে।

—ব্যাপারটা কিন্তু সেভেন্থ হেভেনের চাইতে সিরিয়াস। একটা কিছু কর বাইভি—ছকু বলে। শাদীলাল এবার করুণ কণ্ঠে বললো ঃ

ছকু বাবু কুছু কোরিয়ে দিন। নহী তো ওহি শালা ভেটকা রুপেয়া লিয়ে বহুত মৌজ করবে।

—দি আইডিয়া, ছকু। আই হ্যাভ এ প্ল্যান।

—কী বললি ঠিক বুঝতে পারছিনে।

—বাইভি বাবু, রাষ্ট্রভাষামে বোলিয়ে দিন।

—শোন ছকু, অনোখীর বক্তৃতাগুলো লিখছে কে রে ?

—কোন্ বক্তৃতা ?

—এই যে যজ্ঞের বক্তৃতা, প্রেস কনফারেন্সের।

—আরে আমাদের আধুনিক কবি দোলনা সেন। কেন বলতো ?

—দোলনা সেন। তুই ঠিক জানিস। তা হলে কেল্লা ফতে।

—কোন কিল্লা বাইভি বাবু ? কিল্লাকে কুছ কোরলেই বোহুত সিডিশাস কম্ হোবে। সরকার পাকাড় লিবে।

—আরে না, না, কেল্লা ফতের মানে তুমি যা মনে করেছো তা নয় শাদীলাল। এই ছকু ওকে বুঝিয়ে দেতো। আচ্ছা তার আগে আমার প্ল্যানটা শোন।

—ওহো আপ প্ল্যানকী বাত কোরিয়েছেন। তব তো বড়া উত্তম বাত আছে ঃ শাদীলাল বললো।

—ছাখ ছকু, দোলনা সেন হচ্ছে নরমপন্থী কবি। অর্থাৎ উনি পূর্ণিমার আগে প্রেমের কবিতা লেখেন আর অমাবস্যার আগে ভূতের কবিতা।

—বলিস কীরে বাইভি।

—হ্যাঁ ঠিক বলছি রে। আমি শুনেছি যে অমাবস্যার আগে উনি প্রেমের কবিতা সইতে পারেন না—এবং কেউ যদি তাকে চাঁদনী রাতের আগে ভূতুড়ে গল্প শোনায় তা হলে উনি মূর্ছা যান।

—বঢ়ি তাজ্জবকী বাত আছে—শাদীলাল বললো।

—হ্যাঁ, দ্যাখ, অনোখী আগামী মাসের দুই তারিখে যজ্ঞ করছে এবং তারপরে হবে প্রেস কনফারেন্স। সেদিন হচ্ছে পূর্ণিমা রাত। সেদিন রাত্রে যদি ভূতের ভয় দেখিয়ে দোলনার ঘর থেকে বক্তৃতা হাতরানো যায় তা হলে যজ্ঞ, প্রেস কনফারেন্স সবই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। আজকাল যা দিন পড়েছে যজ্ঞ বা কনফারেন্স না করে দেশনেতা হওয়া সম্ভব নয়।

—তুই কী বলছিস বাইভি ?—ছকু প্রশ্ন করে।

—দ্যাখ, দোলনা সেনের লেখা বক্তৃতা যদি অনোখী না পায় তা হলে ও ব্যাটার ক্ষমতা নেই যে যজ্ঞে বা প্রেস কনফারেন্সে নিজের মন থেকে কিছু বানিয়ে বলে। আর যদি বক্তৃতা না দিতে পারলো তা হলে দেশের লোক ওকে দেশনেতা বলে মানবে না। বুঝতে পারলি।

—ঠিক বলেছিস রে বাইভি। ছকু উৎসাহের সঙ্গেই জবাব দেয়।

—বঢ়ী উত্তম বাত বোলিয়েছেন বাইভি বাবুঃ মন্তব্য করে শাদীলাল।

—তা হলে আমাদের প্ল্যান অফ য়্যাকশন কী হবে বলতে পারিস।

—হমি জোরুর বলতে পারি—শাদীলাল উত্তর দেয়।

—কী হবে ? ছকু প্রশ্ন করে।

—ওহি দুলহন সেনকো অনোখীর নোকরীসে ভাগিয়ে লিতে হবে।

—ঠিক বলেছো শাদীলাল—বাইভি বলে। দোলনা সেনকে রাতে ভূতের ভয় দেখিয়ে অনোখীর বাড়ি থেকে ভাগাতে হবে, আর সুবিধে বুঝে ওর লেখা বক্তৃতা সরিয়ে নিতে হবে।

—কিন্তু একটা বিপদ আছে রে বাইভি—ছকু মন্তব্য করলো।

—কেন রে! কী হলো—বাইভি প্রশ্ন করে।

—কাজটা কিন্তু আর চাট্টিখানি কথা নয়।

—তা হলে—

—একটা উপায় আছে অবিশ্যি। শোন বাইভি, আমি বলছিলুম কী সে রাতে তুই যদি ওকে ভূতের ভয় দেখাতে পারিস তা হলে দোলনা সেন বিলকুল অনোখীর বাড়ি ছেড়ে পালাবে এবং আর বক্তৃতার কপিও হাতরান যাবে।

—তুই আমায় ভূত সাজতে বলছিস ছকু—' বাইভির কণ্ঠে থাকে অনুযোগের সুর।

—পাগল হয়েছিস! তবে কী জানিস। আমরা ভূতের ভয় দেখাতে গেলে মুখোশের দরকার হবে, কিন্তু যদি তুই যাস তা হলে এই সব মেক আপের আর প্রয়োজন হবে না।

—তার মানে তুই বলতে চাইছিস আমি হচ্ছি কালো ভূত।

—কে বলছে রে! জানিস তো ঐ যে রবিঠাকুর না সুভাষ বোস ···হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে সুভাষ বোসই লিখে গেছেন, কৃষ্ণকলি আমি তারে বলি···

—থাক থাক আর কবিতা আউড়ে দরকার নেই, তোর মুখে কবিতা শুনতে পেলে ওঁরা আবার জ্যান্ত হয়ে উঠবেন।

—তা হ'লে তুই যাচ্ছিস না বল—

—আপকো তো জোরুর এহি কম্ করতে হোবে বাইভি বাবু। হম সব কোই তো একহি বাঁশরীর সুরে বাঁধা আছি—শাদীলাল বলে।

এতো অনুরোধের পর বাইভি আর আপত্তি করতে পারে না। কারণ অনোখী দেশনেতা হলে তাদের যে অসুবিধা হবে, তা স্মরণ করে বাইভি শংকিত হয়ে উঠলো। আর দেশনেতা হয়ে অনোখী যদি 'সেভেন্থ হেভেনে' যোগ দেয় তা হ'লে তো আরো বিপদ।

এর পরে বেশ কিছুটা সময় নিস্তব্ধতায় কাটলো। হঠাৎ বাইভি চীৎকার করে উঠলো: ছকুরে—আমার মাথায় আর একটা প্ল্যান এসেছে।

—সিকিণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানকে বাত বোলিয়েছেন বাইভি বাবু।

—কী হলোরে তোর, ছকু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

—শোন 'কিলিং টু বার্ডস ইন ওয়ান ষ্ট্রোক।'

—তার মানে! ছকু বলে।

—মানে হলো গিয়ে দোলনা সেনই হচ্ছে সব কিছুরই শেকড়। যদি শেকড় তুলে ফেলা যায়, তা হলে গাছ আর বাড়বে না।

—বাইভি বাবু হমকো সমঝিয়ে দিন।

—ছাখো শাদীলাল, এই দোলনা সেন হলো গিয়ে সেভেন্থ হেভেনের পাব্লিক রিলেশন্স অফিসার ও অনোখীর বর্তমানে প্রাইভেট সেক্রেটারী। ধরো, যদি দোলনা সেন অনোখীর বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তা হলে সেই সঙ্গে তার কোম্পানীর চাকরি যাবে।

—নিশ্চয় এ কথা আর বলতে—ছকু জোর গলায় বলে।

—অতএব দোলনা সেনকে অনোখীর কাছ থেকে ভূতের ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিতে পারলেই আমাদের কার্যসিদ্ধি। আর সেই সঙ্গে 'সেভেন্থ হেভেন'ও পটোল তুলবে।

—তুই সিরিয়াস্‌লি বলছিস—ছকু বলে।

—ছাখ কাঁচা কাজ এ শর্মা কখনোও করে না। আচ্ছা শোন—

—কী?

—আর জানিস তো সেভেন্থ হেভেন কোম্পানীর সেক্রেটারী হলো গিয়ে মিস্ ভেলভেলেটা চক্কোত্তী। আমি খবর পেয়েছি ভেলভেলেটার সঙ্গে দোলনা সেনের গভীর প্রেম। ধর, দোলনা সেন যদি সেভেন্থ হেভেনের চাকরি ছাড়ে তা হলে ভেলভেলেটা কি করবে বলতে পারিস?

—আলবাৎ 'সেভেন্থ হেভেন'এর চাকরি ছেড়ে দেবে—ছকু জবাব দেয়।

—ঠিক বলেছিস। আচ্ছা এবার শোন, ভেলভেলেটার সঙ্গে প্রেম করতে চাইছে ঐ কোম্পানীর ম্যানেজার বজ্রপাণি চাকলাদার। যদি ভেলভেলেটা 'রিজাইন' দেয় তা হলে আমি জোর গলায় বলতে পারি যে বজ্রপাণি আর একদিনও ঐ কোম্পানীতে কাজ করবে না। এ জানা কথা। তাই না।"

—সাচ বাত বোলিয়েছেন বাইভি বাবু—শাদীলাল মন্তব্য করে।

—আচ্ছা, 'সেভেন্থ হেভেন'এর চীফ একাউন্টেন্ট হলো গিয়ে বজ্রপাণির ছোট ভাই জলপানি চাকলাদার। বড়ো ভাই কোম্পানীর চাকরি ছাড়লে ছোট ভাইয়ের পক্ষে ওখানে একদিন থাকাও সম্ভব নয়। আবার জলপানির সঙ্গে গভীর প্রেম হলো গিয়ে ঐ দপ্তরের টেলিফোন অপারেটার নেড়ী রায়ের। জলপানির পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নেড়ী রায়ও কাজে ইস্তফা দেবে। আবার কোম্পানীর বড়োবাবুও নেড়ী রায়ের প্রেমে মশ্‌গুল। এই পদত্যাগ তিনি নিশ্চয় সহ্য করবেন না এ আমি জানি। কারণ হিয়ায় হিয়া টানে।

—'অহো বাইভি, তুই কী বলতে চাইছিস্ আমি বুঝতে পেরেছি। মোদ্দা কথা হলো গিয়ে দোলনা সেনকে ভাগাতে পারলে কোম্পানী লাটে উঠবে। এবং অনোখীর দেশনেতা হওয়া একদম ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

—যা বলেছিস। ছাখ, আমি ভেবেছি কী জানিস। যজ্ঞের আগের রাতে গিয়ে অনোখীর বাড়িতে আস্তানা গাড়বো। তারপর সুবিধে বুঝে বক্তৃতা হাতরাবো আর দোলনাকে ভূতের ভয় দেখিয়ে ভাগাতে হবে। এই যদি করতে পারি তা হ'লে সেভেন্থ হেভেনে…

একদম ক্রাইসিস। তাই না?—ছকু প্রশ্ন করে।

ঠিক বলেছিস। বাইভি জবাব দেয়।

বাইভির প্ল্যানটা যে চমৎকার তা ছকুও অস্বীকার করতে পারলো না। তাই বললো : সত্যি বাইভি, বিপদের সময় তোর ব্রেন এতো খোলে, কী বলবো। তোকে যে কেন নোবেল প্রাইজ দে'য়া হয় না আমি ভেবেই পাইনে। উফ্ কী গ্রাণ্ড প্ল্যান রে বাবা। তুই সত্যিই নোবেল প্রাইজ পাবার যুগ্যি।

—নোবেল প্রাইজ কুন চীজ আছে, ছকু বাবু।

—আরে রাখো। এ কথাও জানো না। শোন, নোবেল প্রাইজ হলো গিয়ে—ইয়ে···ইয়ে···কী জাতি রে বাইভি? নভেল লিখে··· তাই না···

—ছ্যাখ ছকু আর বাজে বকিস্ নে। যা জানিসনে তা নিয়ে কেন কথা বলিস। বুঝলে শাদীলাল, নোবেল প্রাইজ হলো গিয়ে একটা বিরাট পুরস্কার। অনেকটা লটারী খেলা আর কী। লাখ টাকা প্রাইজ ফ্রী অফ ইনকম ট্যাক্স—"

—ইস মে ভী রুপেয়া আছে। এহি চীজ বাইভি বাবুকো মুফৎ মিলিয়ে যাবে। রাম, রাম···ছকুবাবু আপ হমকো থোড়া ঠাণ্ডা পানী পিলান······

দুপুর বেলা।

'ধাপ্পা সমাচারের' সম্পাদক দপ্তরে মুখ গোমড়া করে বসে আছেন। ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী 'গুলবার্তা' অনোখীর যজ্ঞ করবার খবরটা ছেপে দিয়েছে—'ধাপ্পা সমাচারে' এ খবরটা প্রকাশিত হয়নি। এ রকম খবর অহরহ মিস হয়ে থাকে কিন্তু অনোখীর খবরটা 'মিস' হওয়াতে কাগজের অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী লুটিলুটি হালদার একটু ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

এমন সময় চীফ্ রিপোর্টার হৈ-চৈ পতিতুণ্ডি ঘরে ঢুকলো।

—আমায় ডেকেছিলেন স্যর—হৈ-চৈ জিজ্ঞেস করে।

—কি না তো……হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে। হৈ-চৈ আজকের গুলবার্তা পড়েছো।

খবরের কাগজ সাধারণতঃ হৈ-চৈ পড়ে না। কারণ পড়লেই তার ঘুম পায়। উত্তর দেয়—কাগজে কী আছে স্যর। নাট্যসম্রাজ্ঞী বিদ্যুৎলতার বিয়ের কাহিনী তো! ও স্যর আমরা আগেই জানতুম। এ আর নতুন কী।

—নাহে, হৈ-চৈ, প্রথম পাতায়—

চটকের কথায় বাধা দিয়ে হৈ-চৈ বলে, প্রথম পাতা আমি পড়িনে স্যর। ওতে সব ভুল খবর থাকে। শেষের পাতাই সবচাইতে ইণ্টারেষ্টিং। ওতে প্রথম পাতার ভুলগুলোর 'করেকসন' বেরোয়। তাই ওপাতা পড়লেই যথেষ্ট।

—এই ছাখো, হৈ-চৈ গুলবার্তা কী লিখেছে। 'বিপুল যজ্ঞ। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে বিখ্যাত রিটায়ার্ড ব্যবসায়ী অনোখীলাল পখোটিয়া দেশনেতা হইবার প্রারম্ভে যজ্ঞ করিবেন। আমরা 'লেবর লীডর' হরকরা চাটুয্যেকে সাবধান করিয়া দিতেছি যেন তিনি সময় থাকিতে সাবধান হ'ন। নইলে তাঁহার নাকের সম্মুখেই অনোখী দেশনেতা হইবে—এবং এসেম্বলীর মেম্বরও হইবে। অনোখী দেশনেতা হইলে পর আমরা আর হরকরা বাবুর বক্তৃতা ছাপিতে পারিব না।" আচ্ছা হৈ-চৈ, 'বিপুল' বানান কি হে। হ্রস্বউকার না দীর্ঘউকার।

—ছুটোয়ই হয় স্যর। লোক বেশী হ'লে আমরা হ্রস্বউকার দিই—লোক না হলে দীর্ঘউকার দিই। কারণ তা হলে সবার নজর এদিকে পড়ে।

—কিন্তু এ রিপোর্ট থেকে মোদ্দা কথাটা কিছু বুঝতে পারলে?

—না তো স্যর ঃ হৈ-চৈ জবাব দেয়।

—মানে অতি সহজ এবং প্রাঞ্জল। অনোখীর রাজনীতিক্ষেত্রে নামার নিশ্চয় কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সেটা আমাদের জানতে হবে। নিশ্চয় ও কোন মন্ত্রিত্বের গদী পাবার আশা পেয়েছে কিন্তু সেটা কোন্ 'পোর্টফলিও' সেটা আমাদের জানতে হবে।'

—বলেন কী স্যর। এ তো ভয়ানক কাণ্ড দেখছি। আপনি সত্যিই বলছেন যে অনোখীর দেশনেতা হ'বার পেছনে একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

—নইলে কী আর কেউ সাধ করে দেশনেতা হয়ে লোকের গালমন্দ শোনে। আমি তোমায় বলছি হৈ-চৈ, অনোখীলাল আজ থেকে আর হেঁজিপেঁজি লোক নয়। এখন থেকে ওকে আমাদের তুচ্ছ করলে চলবে না।

—তা হলে উপায় স্যর।

—শোন হৈ-চৈ, আমি ঠিক করেছি যে অনোখীকে নিয়ে একটা বিরাট ইস্কুপ করতে হবে। যেন গুলবার্তা সাতদিন ব্ল্যাক বর্ডার দিয়ে বেরোয়।

—ইসকুপের কথা বলছেন স্যার। সেজন্যে ভাববেন না। বলেন তো এক্ষুণি পাশের ঘরে বসে একডজন ইস্কুপ লিখে দিতে পারি।

—না না হৈ-চৈ, এমন একটা 'লোমহর্ষক' কাহিনী দেবে যেন সবারই তাক লেগে যায়। আমরা সেই যজ্ঞের ও প্রেস কনফারেন্সের বক্তৃতা ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে আমাদের কাগজে ছাপাবো। আর এই ইস্কুপ করবে তুমি। আমি শুনেছি যে অনোখীর বাড়িতে রয়েছে দোলনা সেন। ঐ ব্যাটাই নাকি সমস্ত বক্তৃতা লিখে দিচ্ছে। অনোখীর যজ্ঞের আগের দিন, যেন-তেন প্রকারে তুমি ঐ বক্তৃতার

কপি সংগ্রহ করবে। তারপর বুঝলে হে হৈ-চৈ, সেই বক্তৃতা ফ্রন্ট পেজ, ব্যানার হেড লাইন···হা-হা-হা।

চটকের প্ল্যান শুনে হৈ-চৈ স্তম্ভিত হয়ে যায়। তাই বলে ঃ বলেন কী স্যর। অনোখী বক্তৃতা দেবার আগেই আমরা ঐ বক্তৃতা ছাপাবো !

—তা নয় তো কী ! ঐখানেই তো রিপোর্টারের বাহাদুরী হে ছোকরা।

—আচ্ছা, শোন এবার। ঐ দোলনা সেনই অনোখীর বক্তৃতা লিখে দিচ্ছে।

—কোন দোলনা সেন স্যর। কবি দোলনা সেন।

—কবি না ছাই। ওকে কবি বানালে কে জানো। আমি।

—আপনি স্যর, বলেন কী ! আপনি বুঝি ওর কবিতার ইন্‌স্‌পিরেশন দিয়েছিলেন।

—পাগল হয়েছো।

—তা হ'লে কবিতা ছেপেছিলেন।

—মোটেই না, আমি কবিতা ছাপালুম না বলেই তো ঐ ব্যাটা কবি হয়ে গেলো।

—সে আবার কী স্যর ঃ সবিস্ময়ে হৈ-চৈ প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, ব্যাটা কী কাণ্ড করেছিলো জানো। একদিন 'পাশের বাড়ির চামচিকে' এই নিয়ে এক গদ্য কবিতা লিখে আমার কাছে এলো। আমায় বললে ঃ চটকবাবু আমার কবিতাটা ছেপে দিন। আমি অবশ্য ছাপলুম না, ঐ কবিতাটা ছেপে চাকরিটা খোয়াই আর কী। কর্তার আবার চামচিকেকে যা ভয়। আমি ওর কবিতা ফেরত দিলুম। ও কি করলে জানো ? 'গুলবার্তার' সম্পাদক মুটুর কাছে ঐ কবিতা নিয়ে গেলো, মুটু তো ঐ কবিতা পড়ে একদম কুপোকাৎ।

বললে ঃ দোলনাবাবু বেড়ে লিখেছেন। আমাদের ঐ চটক শালাকে খুব ঠুকেছেন। ব্যাটা ঠিক চামচিকের মতোই দেখতে। আমি আপনার কবিতা ছাপবো। তারপর আমার 'ইলেকসনের' আগে ঐ ছাঁইপাশ ছাপলে, পাড়ার চ্যাংড়া ছোঁড়ার দল বলতে লাগলো ঃ —লোক ঠকায় কে ? পাশের বাড়ির চামচিকে।

বুঝলে হৈ-চৈ, ইলেকসনটা প্রায় জিতেই গিয়েছিলুম। কিন্তু ঐ কবিতাই আমার সব নষ্ট করে দিলো, মায় নিজের গিন্নীও আমার বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে এলো। বাড়িতে এসে গিন্নী বল্লে ঃ দিয়ে এলুম চামচিকের বিরুদ্ধে ভোট। আমি বললুম, করলে কী গিন্নী। আমিই তো ঐ চামচিকে। শালা মুটু আমায় ঐ নাম দিয়েছে। গিন্নী গালে হাতে দিয়ে বললেন ঃ ওমা তাই তো, কী হবো গো। তোমার নামই চামচিকে। আমি তো আরো সবাইকে বলে বেড়িয়েছি চামচিকেকে ভোট দিও না।'

—বুঝলে হৈ-চৈ, সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে গেলো ঐ দোলনা সেনের জন্যে। এবার ভাবছি একঢিলে তুই পাখী মারবো।

—কী করে স্যর ?

—ঐ খানেই তো মজার ব্যাপার। অনোখীর বক্তৃতা ইসকুপ করলে, অনোখী আর দোলনা সেনকে আস্তো রাখবে না। কারণ তা হলে যে সব কাগজ এই খবর 'মিস্' করবে তারা সবাই অনোখীকে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করবে। আর আমি শুনেছি, দোলনা সেন হলো 'সেভেন্থ হেভেন'-এর পাব্লিসিটি অফিসার। অনোখীর কাজ থেকে বরখাস্ত হলে ঐ কোম্পানী থেকেও ওর চাকরি যাবে, এ আমি হলপ করেই বলতে পারি।

—সবই তো বুঝলুম স্যর। কিন্তু দোলনা সেনের তৈরী অনোখীর স্পীচ কী করে আনি বলুন তো ?

—বা রে এতো সোজা ব্যাপার।

—কী করে।

—শোন ঐ বক্তৃতার কপি তোমায় হাতড়াতে হবে।

—হাতড়াতে হবে! সবিস্ময়ে হৈ-চৈ প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, হাতড়াতে মানে চুরি করবে। রিপোর্টারদের 'স্পীচ' চুরি করলে দোষ নেই। লেখা চুরি করেই তো সবাই দেশবিখ্যাত হয়ে গেলো। এ স্পীচ আমি নিজেই বাগাতুম কিন্তু হৈ-চৈ, যেদিন অনোখী এই যজ্ঞ করছে সেদিন হলো গিয়ে আমাদের 'Mourning Day'.

—Mourning Day! সেটা আবার কী স্যর।

—আহা, আমার স্ত্রীর ভাষায় ঐ দিনটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ম্যারেজ য়্যানিভার্সরি। তবে আমি সে দিনটাকে "মোর্নিং ডে" বলেই ডাকি। কারণ বিবাহিতের পক্ষে ওর চাইতে দুঃখের দিন নেই। তুমি তো ব্যাচেলার মানুষ হে—তোমায় আর কী বোঝাবো। যাক্ শোন। আমি লুটিলুটি হালদারের সঙ্গে সমস্ত বন্দোবস্ত করেছি। যজ্ঞ হ'বার আগের দিন রাত্রে তুমি যাবে অনোখীর বাড়িতে। লুটিলুটি তোমায় অনোখীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। বলবে তুমি ঐ ব্যাটার জীবনী লিখতে এসেছো। এ কথা শুনলে ও ব্যাটা ভয়ানক প্লীজড্ হবে। সেই সুবাদেই তোমার ও বাড়ির দরজা খোলা হয়ে যাবে। তারপর যজ্ঞের আগের দিন রাত্রে দোলনা সেনের ঘর থেকে—বুঝলে হে হৈ-চৈ।

—সব বুঝেছি স্যর, সিচুয়েশান একদম ক্লিয়ার। কিন্তু একটা কথা স্যর। দোলনা সেন কী আগের দিন রাত্রে অনোখীর বক্তৃতা তৈরি করে রাখবে।

—তৈরি পাবে মানে—আলবৎ পাবে। দেশভক্তি বিজয়কেতু কী

করতেন জানো। জীবনে তিনি মাত্র একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন— তারপর সারা জীবন শুধু ঐ বক্তৃতাটাই পড়ে গেছেন। শুধু অবস্থা ও সময় বুঝে বক্তৃতার হের-ফের করেছেন। লেবার মিটিংএ গেলে লেবারদের উপর যে প্যারাগ্রাফটা ছিল সেইটে প্রথমে বলতেন। ছাত্রদের মিটিং এ গেলে ছাত্রদের নিয়ে যে প্যারাগ্রাফ ছিল সেইটে প্রথম বলতেন। এই করেই তো দেশভক্তি সারাজীবন বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। আমি তোমায় জোর গলায় বলতে পারি হৈ-চৈ, দোলনা সেন এই দেশভক্তির বক্তৃতাকেই অদল-বদল করে অনোখীর নামে চালাবে। সব দেশনেতাই তাই করে। এখন যদি তুমি বুদ্ধি খেলাতে পারো তা হলে 'গুলবার্তা'কে একদম কাবু করে দিতে পারবো।' চটকের বক্তৃতা শুনে হৈ-চৈ উত্তেজিত হয়ে পড়লো। এবার সে বীরদর্পে জবাব দিলো: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যর। অনোখীর যজ্ঞের বক্তৃতা আপনাকে এনে দিলাম বলে। আপনি 'হেডলাইনটা' তৈরি করুন গিয়ে।'

—হেডলাইন কী আর তৈরি করি নি। সবই ঠিক আছে হৈ-চৈ। কী হেডলাইন দেবো জানো? দেশনেতা অনোখীলাল পখোটিয়ার রোমাঞ্চকর ভয়াবহ ক্রমশঃ বক্তৃতা। দেশব্যাপী তুমুল উত্তেজনা!"

—চমৎকার হেডলাইন স্যর। কিন্তু ঐ ক্রমশঃ কথাটার মানে তো বুঝলুম না।

—ঐ খানেই তো হেডলাইন দেবার বাহাদুরী হে! দেশনেতারা একবার বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলে কী আর থামে। সারাটা জীবন শুধু বক্তৃতা দিয়ে যায় ক্রমশঃ। শব্দ ব্যবহার করার মানে পাঠকদের সাবধান করে দে'য়া যে এই ধরণের আরো বহু বক্তৃতা অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবে।

—সব বুঝেছি স্যর। সব বুঝছি। আমি যাই। আজ আবার সার্কাস দেখার একটা ফ্রী টিকিট পেয়েছি। একটু পরে গেলে আবার ঢুকতে পারবো না।

এই বলে হৈ-চৈ চলে গেলো। চটক গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন।

শাদীলাল ও ছকুকে কথা দিয়ে বাইভি একটু বিপদে পড়লেন। ভূতের ভয় দেখিয়ে দোলনা সেনকে ভাগানো প্রথমটায় যতো সহজ মনে করেছিলেন, পরে ভেবে দেখলেন যে কাজটা ততো সহজ হবে না। কারণ অনোখী বাইভির বহুদিনের পুরাতন বন্ধু। তার বাড়িতে ছদ্মবেশে যাওয়ার অনেক বিপদ। একটু সন্দেহ হলেই অনোখী হয়ত মনে করবে যে, ইন্‌কামট্যাক্সের কেউ এসেছে। এ ভুলের যে কী প্রায়শ্চিত্ত তা বাইভির জানা আছে অর্থাৎ ছ'মাসের জন্যে হয়ত হাসপাতাল বাস।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে আর একটা উপায় আছে। বহুদিন আগে শাদীলাল একবার তাকে এ পন্থা শিখিয়েছিল।

সেদিন ছিল রাসবাগান ও গোঁয়ারগোবিন্দপুরের ফুটবল খেলা। সমস্ত ময়দান জনতায় ভর্তি। মাঠে একটু বসবার জায়গা নেই। রাসবাগান গোঁয়ারগোবিন্দপুরের কাছে এক গোল খেয়ে গেলো। দর্শকেরা চীৎকার হল্লা করতে লাগল। যখন জনতা একটু শান্ত হয়েছে তখন বাইভি শুনতে পেলো এক চীৎকার। একটা দাড়ি-গোঁফওয়ালা ইয়া যোয়ান লোক বলছে ঃ

—ঐ যে হোথায় বসিয়ে আছে—ঘুষ দিয়ে গোল করিয়ে দিল।

কাকে বলছে লোকটা। বাইভি তাকিয়ে দেখে। মেম্বারস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে তাকিয়ে দাড়িওয়ালা লোকটা তখনও টেনে টেনে বাংলায় বলছে।

—আপলোগ উনহেকো চিনহিয়ে রাখুন। ওহি, হোল ব্ল্যাক-মার্কেটির রাজা ছগনলাল পকৌড়ীমল। ঘই'র জগয় বাজারে চর্বি দিল কুন শালা। ওহি পকৌড়ীমল ছগনলাল। সুজির জগয় পাথর দিল কুন, ওহি পকৌড়ীমল ছগনলাল। রূপেয়ার বদলে গোল করিয়ে দিল কুন—ওহি পকৌড়ীমল ছগনলাল।"

বাইভি তাকিয়ে দেখে। আর ভাবে লোকটা বলছে কাকে। ঐ তো শাদীলালের কাকা পকৌড়ীমল ছগনলাল বসে আছে মেম্বারস্ স্ট্যাণ্ডে। নাঃ কোন সন্দেহ নেই দাড়িওয়ালা লোকটা এসব কথা পকৌড়ীমল ছগনলালকেই বলছে।

ওদিকে মেম্বারস্ স্ট্যাণ্ডে বসে আছে পকৌড়ীমল। দাড়িওয়ালার চীৎকার শুনে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আর ভাবছে এসব কথা কাকে বলছে। কিন্তু হঠাৎ যখন নিজের নাম শুনতে পেলো তখন বুঝতে অসুবিধা হলো না যে এ কথাগুলো তাকে লক্ষ্য করেই বলা হচ্ছে। এসব কথা হজম করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ মাত্র সেদিন ভোরেই পকৌড়ীমল সুজির বদলে কাঠের গুঁড়ো দিয়ে একটা মাল চালান দিয়ে এসেছে। জিনিসের দামটা এখনও পায় নি। এ সময়ে প্রতিবাদ করাটা নেহাত মূর্খামি। পকৌড়ীমল অতি সন্তর্পণে স্ট্যাণ্ড থেকে সরে পড়লো।

দাড়িওয়ালা লোকটা তখনও পকৌড়ীমল ছগনলালের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে।

—ওহি ভাগছে কালোবাজারের রাজা পকৌড়ীমল। আপ উনহেকো চিনহিয়ে লিন।

খেলা শেষ হবার পরে দাড়িওয়ালা লোকটা এসে বাইভির কাঁধে হাত দিলে। বললে ঃ রাম রাম, বাইভি বাবু।

আরে শাদীলাল না! এ কী ব্যাপার? ওর আবার দাড়ি গজালো কবে?

—শাদীলাল, একী ব্যাপার! হঠাৎ দাড়ি গজালো কেন?

—এহি সব দাড়ি গোঁপ ঝুটা আছে বাইভি সাহব। আজ সুবহ দোকানসে খরিদ কোরিয়ে লিয়ে আসছি।

—কিন্তু কী ব্যাপার বলোত। আমি তো জানতুম পকৌড়ীমল ছগনলাল তোমারই কাকা। আর তুমি ওরই বাড়িতে থাকো। কিন্তু হঠাৎ ওকে ভয় দেখাতে গেলে কেন—

বিস্মিত কণ্ঠে বাইভি প্রশ্ন করে।

—বাইভি সাহব রূপেয়াকে জরুরতের সময় ভেক না ধরলে পোয়সা কঁহাসে মিলবে। 'দিল কা রানী' ঘোড়াকে উপর বাদ শনিচর কুছু খেলবো, পাঁনশো রূপেয়া চাহিয়ে ইসি লিয়ে। এহি সবকুছু ইসি লিয়েই তো কোরিয়েছি।"

সেদিন রাত্রে পকৌড়ীমল ছগনলাল তার ভাইপো শাদীলালকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ শাদীলাল, ঝুটালালকে তোর ইয়াদ আছে।

—জোরুর আছে। ওহি শালা তো ইস সালমে বোহুত পোয়সা নাফা কোরিয়েছে।

—হ্যাঁ, ঝুটালাল হম্‌সে বোহুত দুশ্‌মনি কোরিয়েছে, আজ হমায় খেলার ময়দানে কেতো গালি দিলো। হমি উনহেকো পুলিশে দেবো।

—তব আপকো সব কুছু ফাঁস হোইয়ে যাবে। আমি জানি ঝুটালাল পুলিসকে বলবে কী আপ উনহেকো সাথ ঘই'র জগয় চর্বি সাপ্লাই কোরিয়েছেন। এহি বাত সরকার জানিয়ে লিবে তব তো—

কথাটা আর শাদীলালকে শেষ করতে হলো না। কারণ পকৌড়ীমল বিবেচনা করে দেখলেন যে শাদীলাল মিথ্যে বলেনি। পুলিসের সাহায্য নেয়া মানেই খাল কেটে কুমীর আনা। তাই করুণ কণ্ঠে বললে : তো হমি কী করবো।

—হমারি বাত শুনহিয়ে লিন। আপ কোই ডিটেক্‌টীভ্‌ ঝুটালালের উপর রাখিয়ে লিন। ঝুটালালকো 'জাসুস্‌' কান পাকাড়কে শিখাইবে কী কম্‌ ক্যায়সে করতে হয়। রূপেয়া যাদা নহী খরচ হোবে। স্রিফ পাঁনশো রূপেয়া।

কথাটা মন্দ বলেনি শাদীলাল। নিজের সিন্দুক খুলে করকরে পাঁচশো টাকার নতুন নোট এনে শাদীলালের হাতে গুঁজে দিয়ে পকৌড়ীমল বললেন—"শাদীলাল এক 'জাসুস্‌' রাখিয়ে লে। ঝুটালালকো শায়েস্তা কোরিয়ে দিতে হোবে।"

পাঁনশো টাকার নোট নিয়ে নাচতে নাচতে এসে শাদীলাল বাইভিকে বললো : বাইভি সাহব, 'দিল কী রানী' তো আভি হমারী হোইয়ে গেলো।

বলা বাহুল্য, এর পরে অবশ্যি আর কেউ কোনদিন পকৌড়ীমল ছগনলালকে ভয় দেখায় নি।

আজ বাইভির এইসব পুরানো স্মৃতি মনে হতে লাগল। কী করে লুকিয়ে অনোখীর বাড়িতে যাওয়া যায়, এইটে হ'লো তার প্রধান চিন্তা। দি আইডিয়া।

আচ্ছা, দাড়ি গোঁপ পরে স্যর গটগটি মিটার সেজে গেলে কেমন হয়। নিজেকে জাহির করতে হবে উদারনৈতিক রক্ষণশীল দলের নেতা বলে। অনোখীর সাথে মোলাকাত করার উদ্দেশ্য—দুজনে হাত মিলিয়ে রাজনীতি-ক্ষেত্রে নামা। ঠিক হয়েছে—এইটে সব চাইতে ভালো পন্থা। আজই তিনি অনোখীকে চিঠি লিখে জানাচ্ছেন

যে, অনোখীর দেশনেতা হবার সংকল্প শুনে তিনি পরম সুখী হয়েছেন। উদারনৈতিক রক্ষণশীল দলের নেতা হিসেবে তিনি অনোখীর সঙ্গে হাত মেলাতে অর্থাৎ রাজনীতিক্ষেত্রে একত্রে কাজ করতে চান। এই বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি অনোখীর কাছে শিগ্‌গিরই আসছেন।

কাগজ কলম নিয়ে বাইভি চিঠি লিখতে বসলো।

চিঠি লেখা শেষ করে বাইভি পরচুলা ও ঝুটা দাড়ি গোঁফ দিয়ে সাজলে। তারপর আয়নায় নিজের মুখটা দেখলো। নাঃ তাকে চেনা যায় না। আচ্ছা বন্ধুরা কেউ চিনতে পারে কি না, একবার পরখ করে দেখা যাক না। কোথায় যাবেন তিনি। হ্যাঁ, ঠিক মনে হয়েছে। কাফে ছ গ্রীলে তিনি কিছুক্ষণ বসবেন। দেখবেন কেউ তাকে চিনতে পারে কি-না।

বিখ্যাত দেশসেবিকা লুটিলুটি হালদার একটু চিন্তায় পড়েছেন। ব্যাপারটা যৎসামান্য নয়, একটু গভীর চিন্তার কারণই বটে। কারণ পর-পর তিন তিনটে চ্যারিটি শো করে লুটিলুটি হালদার অনেক ক্ষতি দিয়েছেন। একটি পয়সাও লাভ করতে পারেন নি। অথচ কিনা তারই চোখের সামনে হাস্নেহানা ভাসু ‘ফ্লড্ রিলিফ’ করে বাড়ি বানালে, চকোরী সেন ‘ফ্যামিন রিলিফ’ করে মোটর গাড়ি, ফ্রিজিডিয়ার কিনলে, উদাসী নাগ ‘সাইক্লোন’ রিলিফ করে বিলেত ঘুরে এল। আশ্চর্য!

লুটিলুটি হালদার প্রথমটায় ‘রিলিফ’-এর কাজে নামেন নি, ফ্ল্যাগ বিক্রি শুরু করেছিলেন। সকালবেলায় যে ফ্ল্যাগ তিন-চার আনা দরে অনোখী, শাদীলাল, ছকুর কাছে বিক্রি করেছিলেন, বিকেল-

বেলা সে ফ্ল্যাগই দু-টাকা দরে অনোখীর ·দল বাজারে ছেড়ে দিলে এ ঘোর অন্যায়।

এরপরে তিনি 'রিলিফ'-এর কাজে হাত দিলেন। ভাগ্নী ভেলভেলেটা চক্কোত্তীর সাহায্য নিয়ে তিনি 'জীবন আমার উতলা হলো' বলে একটি ট্রাজিডি বই মঞ্চস্থ করেছিলেন। উদ্দেশ্য একটি অনাথ আশ্রম বানাবেন। টিকিটও বেশ বিক্রি হয়েছিল, কিন্তু অধিকাংশই বাকীতে। অভিনয় এতো ভালো হয়েছিল যে সবাইকে থিয়েটার শেষে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে হয়েছিল। যারা টিকিট কিনেছিলেন তারা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন: ভাই লুটু, এমন চমৎকার অভিনয় অনেকদিন দেখি নি। তুই যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছিস দেখে আমাদের ভারী হিংসে হয়। টাকা দিয়ে তোর থিয়েটারের বা বা অনাথ আশ্রমের মূল্য যাচাই করা যায় না। তাই টিকিটের টাকা পাঠিয়ে তোর অনাথ আশ্রমের অপমান করতে চাই নে। এর বদলে তোর আশ্রমের জন্যে কয়েকটি আশ্রয়হীন ছেলেকে পাঠালাম। ভর্তি করে নিস।"

লোকগুলোর কাণ্ড দেখে লুটলুটি হালদার বিস্মিত হয়ে যান। কিন্তু কী করবেন। উপায় নেই, অম্লানবদনে সহ্য করা ছাড়া।

এরপরে তিনি আশ্রমের সেক্রেটারী স্বামী খলিলানন্দকে দিয়ে টাকা তুলবার আর দু-একটা চাল চেলেছিলেন। কিন্তু সুবিধে হয় নি। দেখতে পেলেন এই সব আশ্রমের পেছনে যদি একজন দেশনেতা না থাকে তবে টাকা সংগ্রহ করা মুশকিল। তাই তো তিনি অনোখীকে দেশনেতা হবার পরামর্শ দিয়েছেন। একবার অনোখী দেশনেতা হয়ে যদি তার আশ্রমের জন্যে একটা বিবৃতি দেয়, তাহলে তাকে মারে কে? শুধু কী তাই, অনোখী যজ্ঞের পর যে 'প্রেস কনফারেন্স' করবে সেখানেও যাতে তার আশ্রমের নাম উল্লেখ

থাকে সে কথা তিনি দোলনা সেনকে বলেছেন। কারণ দোলনা সেনই তো অনোখীর প্রেস কন্‌ফারেন্সের বিবৃতি তৈরি করে দিচ্ছে আর সেই বিবৃতি ভালো করে ছাপবার জন্যে তিনি "ধাপ্পা সমাচারের" চটক মাশ্চটককে অনুরোধ করেছেন। চটক তাকে কথা দিয়েছে যে প্রেস কন্‌ফারেন্স ও যজ্ঞ 'কভার' করার জন্যে কাগজের চীফ রিপোর্টার হৈ-চৈ পতিতুণ্ডিকে পাঠাচ্ছেন।

আজ লুটিলুটি যে গভীর চিন্তায় মগ্ন তার আর একটি ভিন্ন কারণ আছে। মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে তিনি উদারনৈতিক রক্ষণশীল দলের নেতা স্যর গটগটি মিটারের কাছ থেকে এক চিঠি পেয়েছেন। স্যর মিটার জানিয়েছেন যে, দেশের হিতের জন্যে তার দল ও অনোখীর দলের মিলন হওয়া একান্ত আবশ্যক। দুই দলের মিলন নিয়ে কথাবার্তা চালাবার জন্যে তিনি যজ্ঞের আগের দিন অনোখীর বাড়িতে আসছেন। কথাবার্তা যদি সফল হয় তাহলে প্রেস কন্‌ফারেন্সেই দুই রাজনৈতিক দলের মিলনের খবরটা জানানো হবে।

স্যর গটগটি মিটারের নাম শোনা অবধি লুটিলুটি হালদার একটু চঞ্চল হয়েছেন। অনাথ আশ্রমের জন্যে স্যর মিটারকে ধরলে কেমন হয়। মাত্র লাখ টাকার চেক যদি তিনি কেটে দেন তাহলে আর কোন চিন্তার কারণ থাকবে না। যার নামের আগে অমন খেতাব, তার কাছে তো লাখ টাকা কিছুই নয়।

স্যর গটগটির কাছ থেকে টাকা আদায়ের ভারটা তিনি আশ্রমের সেক্রেটারী স্বামী খলিলানন্দের উপর ছেড়ে দেবেন। এই মতলব নিয়েই তিনি স্বামী খলিলানন্দের বাড়িতে এসেছিলেন। কিন্তু সেখানে এসে শুনতে পেলেন যে স্বামী খলিলানন্দ 'কাফে দ্য গ্রীলে' গিয়েছেন।

খবরটা শুনে তিনি একটু বিচলিত হয়েছেন। কারণ তিনি পইপই করে স্বামী খলিলানন্দকে বলে দিয়েছেন যে যতো দিন তিনি গেরুয়া বসন পরবেন ততো দিন যেন মাছ মাংস না খান। তাঁর মাছ মাংসে আসক্তি আছে এ খবরটা যদি লোকসমাজে জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে অনাথ আশ্রমের জন্যে টাকা সংগ্রহ করা একটু মুশকিল হতে পারে। কিন্তু 'কাফে দ্য গ্রীল' মুর্গির শিককবাব ও হাঁসের রোগনজোসের জন্যে প্রসিদ্ধ। অতএব সেখানে স্বামী খলিলানন্দের গমনের কারণ আঁচ করে নিতে তাঁর একটু মুশকিল হলো না। উফ্, স্বামী খলিলানন্দকে যে কী করে সামলাবেন তিনি ভেবে পাচ্ছেন না। রাগে তার শরীরটা চড়চড় করতে লাগলো। আচ্ছা, খলিলানন্দ যে মাংস খায় এ খবরটা যদি স্যর গটগটি জানতে পারেন তাহলে কী আর অনাথ আশ্রমের জন্য টাকা আদায় করা সহজ হবে। স্যর মিটার হয়ত ভাববেন সন্ন্যাসীটি জোচ্চোর।

না, আজ এর একটা হেস্তনেস্ত করা চাই। এ ভাবে চললে আশ্রমের টাকা উঠবে না।

এই কথা ভাবতে ভাবতে লুটিলুটি হালদার কাফে দ্য গ্রীলে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু স্বামী খলিলানন্দের দেখা কোথাও পেলেন না। কিন্তু হঠাৎ চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখতে পেলেন তা দেখে তার চক্ষু স্থির হয়ে গেলো। রেস্তরাস্তের একপ্রাস্তে বসে আছে কবি দোলনা সেন। তারই সঙ্গে বসে আছে আর একজন অপরিচিত ভদ্রলোক।

ঝুটালাল লুটেরমলের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা হবার পর থেকে অনোখীলাল পখোটিয়ার মনে সোয়াস্তি নেই। কারণ

ঝুটালালের সঙ্গে টাকা পয়সার লেনদেন করবার কী দুর্গতি এটা অনোখীর বিলক্ষণ জানা আছে।

একবার 'আকাশকুসুম' কটন মিলের শেয়ার বিক্রি করতে এসেছিল ঝুটালাল লুটেরমল। নাচ হলো, গান হলো, তারপর সানন্দে অনোখীর শেয়ারের কাগজে নিজের নাম সই করে দিলেন। ছয়মাস পরে আদালত থেকে এক সমন এসে হাজির। দেনার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন অনোখীলাল পখোটিয়া। লাখ টাকা ধার করা হয়েছে ঝুটালাল লুটেরমলের কাছ থেকে। অনোখী তো অবাক! তিনি আবার কবে ঝুটালালের কাছ থেকে টাকা ধার করলেন। জোর গলায় অনোখী দেনার কথা অস্বীকার করলেন। কোনদিনই তিনি ঝুটালালের কাছ থেকে টাকা ধার করেন নি।

কিন্তু আদালতে ঝুটালাল এনে হাজির করলে অনোখীর সই-করা 'হ্যাণ্ডনোট'। সেই যে 'আকাশকুসুম' কটন মিলের শেয়ারের কাগজে অনোখী নিজের নাম সই করেছিল। আসলে সেইটে ছিল 'হ্যাণ্ডনোট'। নাচের মৌজে অনোখী ভালো করে দলিলটা খুঁটিয়ে দেখতে পারেন নি। তাইতো অতো বিভ্রাট।

এর পর থেকে অনেকে ঝুটালালকে আর বিশ্বাস করেন না। ঝুটালালের নাম শুনলেই শংকিত হন, যদিও তিনি একবার ওকে সিদ্ধি খাইয়ে বেশ শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার বেশ বেকায়দায় পড়ে আবার ঝুটালালকে তাঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন করতে হয়েছে।

কিন্তু এবার তাঁকে বেশ হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করতে হবে। তাই ঠিক করলেন একজন সলিসিটার ফার্মের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নিয়েই তিনি এ কাজে হাত দেবেন। তারপর ঝুটালালের কাছ থেকে শেয়ারগুলো হাতড়ে নেবেন। ব্যস্, তারপর আর কথা নেই। পরদিন সকালে ঝুটালাল

যখন তাকে শেয়ার দিতে পারবে না, তখন কী মজাটাই না হবে। ব্রীচ্ অফ কন্ট্রাকটের দায়ে ফেলবেন তিনি ঝুটালালকে।

কিন্তু কার সঙ্গে পরামর্শ করা যায়। বিখ্যাত সলিসিটর্স ফার্ম বাটপারিয়া, বাটপারিয়া বাটপারিয়া য়্যাণ্ড সন্স হলো গিয়ে তার সলিসিটর্স। কিন্তু বাটপারিয়া বাটপারিয়া বাটপারিয়া ফার্মের অংশীদার শিউচাঁদ বাটপারিয়া হলো ঝুটালালের ভাগ্নে। অতএব এ কাজে তাকে বিশ্বাস করা যায় না। এজন্য তাকে অন্য কোন নতুন সলিসিটর্স ফার্মের সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু কাকে বলা যায়!

টেলিফোন ডাইরেক্টরীটা খুলে বসলেন অনোখীলাল পখোটিয়া, তারপর আস্তে আস্তে সলিসিটার্স ফার্মগুলোর নাম দেখতে লাগলেন। এই যে একটা মনোমত ফার্ম পেয়েছেন···ঘুঘুরাম চৌধুরী, ঘুঘুরাম চৌধুরী, ঘুঘুরাম চৌধুরী য়্যাণ্ড পার্টনার্স।”

টেলিফোন তুলে অনোখীলাল ঘুঘুরাম চৌধুরী ফার্মের নম্বর চাইলেন।

ময়দানের ডান পাশ দিয়ে গঙ্গার দিকে যে রাস্তা চলে গেছে তারই শেষ প্রান্তে বড়ো এক বাড়িতে তিনতলার এক ঘরের সামনে লেখা আছে “ঘুঘুরাম চৌধুরী, ঘুঘুরাম চৌধুরী, ঘুঘুরাম চৌধুরী য়্যাণ্ড পার্টনার্স, সলিসিটর্স য়্যাণ্ড হোয়াট নট্।”

এই শেষের তিনটি শব্দ যোগ করবার একটি কারণ আছে।

কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার ঘুঘুরাম চৌধুরীর অতি অল্প বয়স থেকেই প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ হবার শখ ছিল। শার্লক হোমস্, আগাথা ক্রিষ্টি, কিরিটী রায় ছিল তাঁর মুখস্থ। বাল্যকালে একবার তাঁর অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিতেও তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

ব্যাপারটা ছিল এইপ্রকার।

একদিন ঘুঘুরামের মা জানালেন যে রান্নাঘর থেকে একবাটি মাছ উধাও হয়েছে।

ঘুঘুরাম তখন সবেমাত্র কিরিটী রায়ের বই শেষ করেছে। মার মুখে যেই শুনতে পেলে যে রান্নাঘর থেকে মাছ উধাও হয়েছে আর যায় কোথায়।

তক্ষুণি ঘুঘুরাম হারানো মাছের সন্ধানে বেরুল। ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস দিয়ে পায়ের ছাপ, মাছের কড়াই পরীক্ষা করে ঘুঘুরাম আবিষ্কার করলে যে চোরের গোঁফ আছে আর দেহে আছে লোম।

সমস্ত কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে ঘুঘুরাম চোরের সন্ধানে বেরুল। একটু বাদে আবিষ্কার করলে যে তার বাবার গোঁফ আছে আর বুকে বড়ো বড়ো লোম! ব্যস্, আর কথা নেই। মাকে গিয়ে জানাল: মা, মাছ চুরি করে কে খেয়েছে জানো? বাবা।

কথাটা ঘুঘুরামের বাবার কাণে গেলো। ঘুঘুরামকে ধরে তিনি এমনি মার দিলেন যে ঘুঘুরামকে বেশ জোর গলায় কাঁদতে হলো। কাঁদতে কাঁদতে দেখতে পেলো যে তার বোনের আদরের পুষি বেড়াল মাছ খেয়ে কাঁটা চুষছে।

সেদিন থেকে ঘুঘুরাম কখনও ডিটেক্‌টিভ হবার সংকল্প ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করে নি। কিন্তু তার মনের গহন কোণে এ ইচ্ছাটা চিরকালই সুপ্ত ছিল।

তারপর ঘুঘুরাম সলিসিটরি পাশ করলে, ঘুঘুরাম চৌধুরী, ঘুঘুরাম চৌধুরী, ঘুঘুরাম চৌধুরী কোম্পানী ফাঁদলে। সুবিধে পেলেই লেন্স দিয়ে পুরানো দলিলপত্র ঘেঁটে দেখতে লাগল দলিল আসল না জাল। মক্কেল এলেই তার দাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে, এটা নকল দাড়ি কি

না। তারা চলে গেলে পরে হাতের ছাপ তুলে রাখে ভবিষ্যৎ-এর জন্যে।

আজ দপ্তরে ঘুঘুরাম বসেছিল। বেশ শংকিত মন নিয়েই বসেছিল। অবশ্যি এর একটা কারণ আছে। কিছুদিন আগে ঘুঘুরামের কাছে একটা কেস এসেছিল। ৩০৪ ধারার আসামী, বড়োজোর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হতে পারে। ঘুঘুরাম ও তার উকিল এমনি ভাবে কেস লড়লে যে হাকিম মন্তব্য করলেন, "যা দেখছি তাতে একে ৩০২ ধারায় চালান দিতে হতে পারে।"

ঘুঘুরামের মক্কেলের ৩০২ ধারায় ফাঁসির হুকুম হয়ে গেলো।

মক্কেল এসে হানা দিলে ঘুঘুরামের কাছে। বললে, "হুজুর এ কী হলো। ছিলুম ৩০৪ ধারায়, বড়োজোর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হতো। এখন দেখছি ৩০২ ধারায় আসামী হয়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে যাচ্ছি। আপনি কী করলেন আমার।"

হেসেই এ প্রশ্নের জবাব দিলে ঘুঘুরাম। বললে : তোমার যে কতোখানি উপকার করেছি তা তুমি জানবে কী হে ? ছিলে তো ৩০৪ ধারার আসামী, কেস এমনি লড়লুম, ম্যাজিষ্ট্রেট বাধ্য হয়ে তোমায় ৩০২ ধারায় নাবিয়ে দিলেন। হেঁ হেঁ, আমি লড়লুম বলেই তো তোমায় দুটো ধারা নাবিয়ে দিলে। ওকি চাট্টিখানি কথা হে—

মক্কেল কোন জবাব দিলে না, শুধু একবার রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে গেল। ভাবটা এমনি যেন তক্ষুণিই ঘুঘুরামকে খুন করেন। ঘুঘুরাম বেশ শংকিত হয়ে রইল। লোকটার ফাঁসি না হয়ে যাওয়া অবধি বিশ্বেস নেই। কখন কী করে বসে। তাই ঘুঘুরাম একটু সতর্ক হয়ে আছে। কিরিটী রায় বলেছেন যে এ সময়ে কাউকে বিশ্বাস নেই।

এমনি সময় ঘুঘুরামের টেলিফোন বেজে উঠলো।

—হ্যালো

—হ্যালো

—আপ কুন বোলিয়েছেন—

—ঘুঘুরাম চৌধুরী

—রাম, রাম, ঘুঘুরামবাবু। হমার নাম আছে অনোখীলাল পথোটিয়া।

ব্যস্, আর কোন সন্দেহ নেই। এই সেই মক্কেলের গলা। না কোন ভুল নেই। কেমন বাংলা হিন্দী মিশিয়ে চলছে।

নিজের মনের শংকা প্রকাশ না করে ঘুঘুরাম প্রশ্ন করলে : কী দরকার।

—ঘুঘুবাবু এক রোজ বাদ হমার মোকান আসতে পারবেন ? বোহুত বঢ়িয়া কম আছে।

ভুল নেই, ভুল নেই—নির্ঘাৎ সেই মক্কেলের গলা। ঘুঘুরামকে ভুলিয়ে নেবার জন্যই গলা নকল করছে। তারপর হয়তো গভীর রাত্রে নির্জন কোন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাকে খুন করবে। এমনি ভাবে যে লোক গায়েব করা হয় একি সে জানে না। 'হারকুল পয়রেটের' ইতিহাস তার মুখস্থ, কিরিটীর প্রতি সতর্কবাণী তার নখদর্পণে। সে কী আর জেনে শুনে ফাঁদে পা দিতে পারে! লোকটা গলা নকল করলে কী হবে, এই যে তার মক্কেলের গলা এ সে নিঃসন্দেহেই বলে দিতে পারে। তাই দৃঢ়স্বরে জবাব দিলে : না আমি অন্য কোথায় বড়ো যাই নে।

—আরে ঘুঘুবাবু, বেফিকর রোহিয়ে যান। এক দিনকো তো বাত আছে।

—তা বাপু আমার বাতের ব্যথা নেই। ওসব বুজরুকী চলবে না।

এই বলে সশব্দে ঘুঘুরাম টেলিফোন ছেড়ে দিল।

কিন্তু মুখ তুলে যাকে সে দেখতে পেল তাকে দেখে বিস্মিত হলো।

সে আর কেউ নয়, বিখ্যাত কবি দোলনা সেন।

ঘুঘুর গলা জড়িয়ে ধরে দোলনা সেন বললে : ঘোঁঘো জানিস, তুই আমার ছেলেবেলার বন্ধু।

দোলনার কথা শুনে ঘুঘু শিউরে উঠে। দোলনা কী পাগল হয়ে গেলো না কি। এই বুড়ো বয়সে বাল্য জীবনের স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছে।

—আমার 'আত্মজীবনী' থেকে বাল্যস্মৃতির চাপ্টার বাদ দিয়েছি রে দোলনা, ঠিক করেছি বর্তমানে ওটা প্রকাশ করবো না—ঘুঘুরাম নীরস কণ্ঠেই জবাব দেয়।

—তাহলেও আমরা বন্ধু। দুজনে একই স্কুলে পড়েছি, একই বেঞ্চিতে বসতুম, তাই নয় কি ?

—না, না, বসবার সুযোগ আমি আর পেলুম কখন। মাষ্টারগুলো কি আর ক্লাসে সোয়াস্তি দিত। সর্বক্ষণই তো আমায় বেঞ্চিতে দাঁড় করিয়ে রাখত।

—তাহলেও ঘোঁঘা আমরা পুরানো বন্ধু। কী বলিস।

—জানি। কিন্তু কী ব্যাপার, টাকা ধার চাই বুঝি।

—না, আমার পেছনে টিকিটিকি লেগেছে। দোলনা সেন জবাব দিলে।

ঘরের এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে ঘুঘুরাম জবাব দেয়। কৈ না তো, ঘর তো একদম ফাঁকা। এখানে তো টিকটিকির ল্যাজও দেখতে পাচ্ছি নে।

—দেয়ালের টিকটিকি নয় রে ঘোঁঘো, মানুষ টিকটিকি। অর্থাৎ আমার পেছনে ফেউ লেগেছে।

এবার ঘুঘুরামের বিস্ময়ের পালা। প্রায় চীৎকার করেই বলে : ফেউ মানে, গোয়েন্দা অর্থাৎ—স্পাই। তুই বলিস কী রে দোলনা, এ যে রীতিমতো খুন, রাহাজানি, ডাকাতি······

—হ্যাঁরে তাই। এইমাত্র আমি কাফে ছ গ্রীলে বসে খাচ্ছিলাম, এমনি সময় দেখতে পেলাম একটা দাড়িওয়ালা লোক আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সেদিন ভেলু বললে······

—ভেলু! সে আবার কে? প্রশ্ন করে ঘুঘুরাম।

—ভেলু! অহো তোকে মোদ্দা কথাটা বলতে ভুলে গেছি। শোন্ আমি লুটিলুটি হালদারের ভাগ্নী ভেলু মানে ভেলভেলেটা চক্কোত্তীর প্রেমে পড়েছি।

—কোন্ লুটিলুটি হালদার? প্রশ্ন করে ঘুঘুরাম।

—আরে বিখ্যাত দেশসেবিকা লুটিলুটি হালদার। অনোখীলাল··· কথাটা শেষ করতে পারলে না দোলনা সেন।

কারণ অনোখীর নাম উচ্চারণ হ'বার সঙ্গে সঙ্গে ঘুঘুরাম অসহায় করুণ দৃষ্টিতে দোলনা সেনের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো তার মক্কেলের ছবি আর নকল কণ্ঠস্বরে টেলি-ফোনের কথা। বুঝতে পারলে যে মক্কেলের অনুচরেরা বেশ বড়ো রকমের জাল ফেঁদেছে। তারপর জিজ্ঞেস করলে। অনোখীলাল পখোটিয়ার নাম কচ্ছিস তো?

—চিনিস নাকি ওকে?

—না।

—তাহলে নাম জানলি কী করে?

—ঐখানেই তো সলিসিটরী বাহাদুরী রে। শোন্, তুই আসবার

একটু আগে আমার এক মক্কেল অনোখীলাল পখোটিয়ার নাম করে ওর বাড়িতে আমায় রাত্রিবেলা যেতে বলছিল। আমি কী আর ওর ফন্দী বুঝি নি। রাত্রিবেলা যাই, আর তারপর 'মার্ডার এ্যাট মিডনাইট্' হয়ে যাক আর কী? যাক্ তোর দাড়িওয়ালা লোকটার কাহিনী বল।

—ছ্যাখ্ লোকটা কী কট্মট্ করে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। দেখে মনে হলো যেন কাবুলিওয়ালা তাকিয়ে আছে। আর চাল-চলন দেখে মনে হলো যে ব্যবসায়ী হবে হয়তো।

—গুড লর্ড। দোলনা রে, এবার সবকিছু স্বচ্ছ সরল হয়ে গেছে।

—কী?

—ডাঃ জেকিল এ্যাণ্ড মিঃ হাইড।

—মানে?

—ঐ দাড়িওয়ালা লোকটা হলো ইন্টারন্যাশনাল গ্যাংস্টার। কাল কাগজে পড়িস নি পুলিস কমিশনারের সতর্কবাণী। 'চোর ও জুয়াচোর' নজদিগ আছে। আমি হলপ করে বলতে পারি লোকটার দাড়িগুলো নকল।

—তুই ঠিকই বলেছিস রে ঘোঁঘো। ভেলু নাকি কাল মেট্রোতে ঐ লোকটাকে এডওয়ার্ড জি রবিনসনের এক বইতে পার্ট করতে দেখে এসেছে। 'ভিলেন'-এর পার্ট করছিল। কী আশ্চর্য ব্যাপার ছ্যাখ দিকি নি! এক রাত্তিরে নিজের ভোল পাল্টে নিলে।

এবার ঘুঘুরামের বিজ্ঞের মতো জবাব দেবার পালা। বলে: ঐ তো ওদের বাহাদুরী রে। সকালবেলায় ওদের যদি দেখিস 'চীনাম্যানের' পোশাকে, বিকেলে দেখবি ওরা বর্মীজ সেজেছে। আবার রাত্রিবেলা ইংরেজ। এইসব ইন্টারন্যাশনাল গ্যাংস্টারদের ঐ তো কাণ্ড। 'মেক আপে' এক্সপার্ট।

—তুই ঠিক বলছিস!

—আলবাৎ। জানিস এদের সম্বন্ধে কিরিটী রায় কী বলে গেছে।

—কী?

—বলেছে এইসব গ্যাংস্টারদের এড়িয়ে চলতে। 'ইন কেস অফ এমার্জেন্সী রিং আপ লালবাজার।'

ঘুঘুরামের কথা শুনে দোলনার মুখ শুকিয়ে গেলো। বললেঃ ঘোঁঘো—

—কী?

—তুই আমার বাল্যবন্ধু।

—'ক্লেম' করতে পারিস। 'আত্মস্মৃতিতে' বাল্যজীবনের চাপ্টার লিখবো ঠিক করলাম।

—আমার ভয় করছে ঘোঁঘো।

—হাঁ, হাঁ। ঘুঘুরাম শর্মা থাকতে তোর আবার ভয় কিসের?

—তাহলে কী হবে?

—চল তোর দাড়িওয়ালা গুণ্ডাটাকে দেখে আসি?

—চল।

দোলনা সেন ও ঘুঘুরাম ক্যাফে ছ্য গ্রীলের দিকে রওনা হলো। পথে যেতে হোত ঘুঘুরামের হঠাৎ তার সেই মক্কেলের কথা স্মরণ হলো। জিজ্ঞেস করলেঃ হ্যাঁরে দোলনা, তুই ঠিক জানিস তো রে, লোকটার দাড়ি আছে?"

ঘুঘুরামের মক্কেলের দাড়ি নেই।

—দাড়ি বলতে দাড়ি। একেবারে সোঁদরবন। মুখটাই দেখা যায় না।

দোলনার জবাব শুনে ঘুঘুরাম যেন একটু আশান্বিত হলো।

ছদ্মবেশ পরে স্যর গটগটি মিটার ওরফে বাইভি এসে উপস্থিত হলেন, ক্যাফে ছ গ্রীলে। ব্যোয়কে ডেকে ছুটো 'প্রাণ চাই' রসগোল্লা ও একটা 'হৃদয় বিদারক' সন্দেশের হুকুম দিলে।

বাইভি রসগোল্লা মুখে দেবার জন্যে যেই মুখ তুলেছে অমনি তার দৃষ্টি গেলো সামনের ক্যাবিনে। দেখতে পেলো কবি দোলনা সেন বসে আছেন।

বাইভির মুখে রসগোল্লা উঠলো না। তিনি এক দৃষ্টে দোলনার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে বাইভির চেতনা হলো। তিনি আবার ক্যাবিনের দিকে তাকালেন।

এ কী রে কাণ্ড বাবা। এবার দোলনার সঙ্গে বসে আছে আর একটি অপরিচিত লোক। বাইনাকুলার দিয়ে তারই দিকে তাকাচ্ছে। বিশেষ করে পরচুলা দাড়ি গোঁফের প্রতি দৃষ্টিটা যেন তীক্ষ্ণ।

বাইভি বুঝতে পারলেন ক্যাফে ছ গ্রীলে বেশীক্ষণ বসে থাকা ন্যায়সংগত হবে না।

বাইনাকুলারওয়ালা লোকটাকে তিনি যেন কোথায় দেখেছেন। কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। কোথায়······কোথায়···

কিন্তু আবার তাঁর চিন্তায় বাধা পড়লো। ক্যাবিনের দিকে তাকিয়ে তিনি যাকে দেখতে পেলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি বিখ্যাত দেশসেবিকা লুটিলুটি হালদার।

ঘুঘুরামকে নিয়ে এসে দোলনা সেন ক্যাফে ছ গ্রীলের ক্যাবিনে বসল।

পকেট থেকে একটা ছোট বাইনাকুলার বের করে ঘুঘুরাম জিজ্ঞেস করলে : কোন্ লোকটা রে ?

—ঐ যে ক্যাবিনের বরাবর বসে আছে : বাইনকুলার দিয়ে দেখতে লাগল ঘুঘুরাম।

—লোকটার চাউনি বেশ সন্দেহজনক বলেই মনে হচ্ছে। আমার মনে হয় কী জানিস, লোকটা তোর উপর নজর রাখছে।

—আমার উপর ?

—আলবাৎ, নইলে এমনি ভাবে কেউ কখনও তাকায়। আমি ঘুঘুরাম চৌধুরী। আমার চোখে ধুলো দেয়া সোজা ব্যাপার নয়। হ্যারে দোলনা, ঐ মেয়েটি কে দ্যাখতো। হনহন করে আমাদের দিকে আসছে।"

বাইনাকুলার চোখে লাগিয়ে দোলনা দেখতে পেলো যে লুটিলুটি হালদার তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

'ক্যফে দ্য গ্রীলে' দোলনা সেনকে যে তিনি দেখতে পাবেন এটা লুটিলুটি হালদার কল্পনা করেন নি। স্বামী খলিলানন্দের সন্ধানে তিনি এখানে এসেছিলেন, কিন্তু দেখতে পেলেন একটা ক্যাবিনে দোলনা সেন। আর তারই পাশে একটা লোক বাইনাকুলার দিয়ে মেয়েদের দেখছে। 'কী' আশ্চর্য ! দোলনা কী 'ম্যানার' জানে না। না, তিনি দোলনাকে কষে ধমকে দেবেন।

গট্‌গট্ করে তিনি দোলনার ক্যাবিনে এসে উপস্থিত হলেন। রাগে তাঁর চোখমুখ জ্বলছে। ধমক দিয়ে বললেন : দোলনা একী ব্যাপার ? অসভ্যের মতো বাইনাকুলার লাগিয়ে কী দেখছো।

জবাবটা এলো ঘুঘুরামের কাছ থেকে। জবাব দিলে : ইন্টারন্যাশনাল গ্যাংস্টার, 'কিরিটী রায় কীপিং এ্যান আই অন দেম।'

কাউকে পালাতে দিচ্ছি না। উঁহু, মেয়েমানুষের আবির্ভাব। সিচুয়েশান ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ছে দেখছি।

"তুমি ছোঁড়া কে হে এতো ফড়ফড় করছো—ধমক দিয়ে বলেন লুটিলুটি হালদার। দোলনা সেন অতি বিপদেও ভেঙ্গে পড়েন না।

মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মাথায় কী ফন্দী খেলে গেলো কে জানে। চটপট জবাব দিলে : লুটিলুটি-দি, এঁকে চেনেন না। ইনিই হলেন ধাপ্পা সমাচারের রিপোর্টার হৈ-চৈ পতিতুণ্ডি।

"আপনিই হৈ-চৈ পতিতুণ্ডি! সম্মুখে সমরে পড়ি···আপনারই লেখা," বিস্মিত কণ্ঠে লুটিলুটি হালদার জিজ্ঞেস করলেন।

ঘুঘুরাম হতবাক্।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে দোলনা সেনই জবাব দেয় : আলবাৎ লুটিদি। হৈ-চৈ কী যে-সে ছেলে। ঐ তো লিখেছিল সেই ইংরাজী কবিতা। কী নাম জানি···ফরওয়ার্ড মার্চ, ফরওয়ার্ড মার্চ··· তারপর কী জানি হৈ-চৈ।"

বিস্ময়ের ঘোর তখনও ঘুঘুরামের কাটে নি। তাই বেশ অন্যমনস্ক হয়েই জবাব দিল : হ্যাঁ, ইণ্টারনাশনাল গ্যাংস্টার ইন ফ্রণ্ট অফ দেম। ক্রুক্স্ টু দি বাইট অফ দেম।······কিন্তু ভায়া ওটাতো আমার লেখা নয়······

ঘুঘুরামের কথা শেষ হবার আগেই দোলনা সেন বলে···জানি হে, জানি। ঐ কবিতার পেটেণ্ট তুমিই নিয়েছিলে, কিন্তু লিখেছিল অন্য আর-এক জন। কিন্তু যাক্‌গে ও কথা। লুটিদি, আপনি হৈ-চৈর সেই 'শত্রুসমরে নারী' রিপোর্টটা পড়েছিলেন। উফ্, কী বেড়ে লিখেছিল। সমস্ত নারী মহলে এই নিয়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তাই না হৈ-চৈ······

বহুদিন সমাজে মিশে লুটিলুটি হালদার সমাজের একটি কায়দা-কানুন রপ্ত করেছিলেন। অর্থাৎ যে জিনিস জানা নেই, সে জিনিস সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করা মূর্খামি। অতএব এবারও লুটিলুটি হালদারকে বলতে হলো···সত্যি হৈ-চৈ বাবু। কী চমৎকার না হয়েছিল আপনার সেই লেখাটা। সেই লেখা পড়ে আমায় মিসেস পাকড়াশী কী বললেন, জানেন? বললেন, লুটু দেখেছিস কী চমৎকার রিপোর্ট, পড়লেই মনে হয় যে লোকটার বউ মারা গেছে, আচ্ছা চৈ-হৈ বাবু—

—ওর নাম চৈ-হৈ নয়, হৈ-চৈ পতিতুণ্ডি—দোলনা সেন বললে।

—এই দেখুন। আমি আপনার নামটাই ভুলে বসে আছি। আচ্ছা, হৈ-চৈ বাবু আপনাদের এই রিপোর্টিং লাইনটা খুবই মজার, তাই নয় কী।

এবার ঘুঘুরাম উত্তর দিলে ঃ যা বলেছেন। আমরা কী না করতে পারি। দরকার হলে ৩০৪ ধারা থেকে লোককে ৩০২ ধারায় চালান দিতে পারি।

—মানে—

—মানে লোককে ফাঁসিকাঠ থেকে আন্দামান চালান দিতে পারি—ঘুঘুরাম উত্তর দেয়। মক্কেলের কথাটা উল্লেখ না করে সে পারলে না।

—ওরে বাপ্‌স। আচ্ছা আপনারা অনাথ আশ্রম নিয়ে নিশ্চয় অনেক লেখেন—

—লিখি মানে। আমি তো ঠিক করেছি অনাথ আশ্রমকে নিয়ে একটা রহস্য উপন্যাস সৃষ্টি করবো।

—না না, দেখুন আমার একটা অনাথ আশ্রম আছে।

—বুঝতে পেরেছি সেখানে কোন খুন হয়েছে—

—কী যে বলেন !

—তা হ'লে নির্ঘাত এলোপমেণ্ট। বুঝতে পারছি কেশটা জটীলই বলে মনে হচ্ছে।

—পাগল হয়েছেন। আমার অনাথ-আশ্রম একদম 'স্পটলেস'।

—তা হ'লে চিন্তা করে কী হবে। ইনভেষ্টিগেশন করে লাভ নেই।

দোলনা সেন এতোক্ষণ কথাবার্তা শুনছিল, কোন মন্তব্য করে নি। এবার না বলে পারলে না। বললেঃ না হে হৈ-চৈ। তুমি ঠিক লুটিদির কথা বুঝতে পারো নি। লুটিদির মতলব হচ্ছে যে তিনি একটা অনাথ-আশ্রম বানাবেন। অর্থাৎ নিঃসহায়দের জন্যে তিনি দেশ-বাসীদের কাছে আবেদন জানাতে চান। উনি চাইছেন তুমি তাঁর এই মহৎ সংকল্পের একটু পাব্লিসিটি করে দাও। তাই নয় কী, লুটিদি ?

—ঠিক বলেছো দোলনা—লুটিলুটি হালদার জবাব দিলেন।

—এ আর কঠিন কাজ কী—দোলনা বলে—আপনি ভাববেন না। আমি লিখব—হে দেশবাসিগণ আজকাল যে ব্যাং-এর ছাতার মতো অনাথ আশ্রম গজিয়ে উঠছে, ওতে আর বিশ্বাস করবেন না। বরং বিশ্বাস করুন এই লুটিদির অনাথ আশ্রমকে। এ হলো একদম 'ক্যারেট গোল্ড।' ভেজাল প্রমাণে দু হাজার টাকা।

ঘুঘুর কথা শুনে লুটিলুটি হালদার একটা করুণ আর্তনাদ করে ওঠেন। বলেনঃ না না, আমি টাকা দেবো না। আমি আশ্রমের জন্যে টাকা চাই। বরং আপনি লিখবেন আশ্রমের জন্যে আপনারা টাকা দিন। এগিয়ে আসুন আপনারা সাহায্য করতে। তারপর আপনার সেই কবিতাটা লাগিয়ে দেবেন, 'ফরোয়ার্ড মার্চ, ফরোয়ার্ড মার্চ......'

—হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই কবিতাটা লাগিয়ে দেবেন। আর সেই সঙ্গে 'শত্রু সমরে নারী'র থেকে এক প্যারাগ্রাফও দিয়ে দেবেন!—কথাটা বলে দোলনা সেন একটু গর্বের সঙ্গে তাকায়। লুটিলুটি হালদার দোলনাকে জিজ্ঞেস করলেন: দোলনা, চৈ-হৈ বাবুকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসছো তো।"

—আজ্ঞে উনি তো চৈ-হৈ বাবু নয় লুটিদি। উনি হলেন হৈ-চৈ বাবু: দোলনা বলে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ হৈ-চৈ বাবু। আচ্ছা, হৈ-চৈ বাবু তা হ'লে কবে আসছেন আমাদের বাড়িতে।

—আপনাদের বাড়িতে। সে কী ব্যাপার—করুণ কণ্ঠে ঘুঘুরাম জিজ্ঞেস করলে।

—বাঃ রে এর মধ্যেই ভুলে গেলেন। চটকবাবু আমায় বললেন: মিস হালদার অনোখীর যজ্ঞের রিপোর্ট কভার করতে হৈ-চৈ যাবে। তারপর ঐখান থেকেই যজ্ঞের বিবরণ লিখবে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার অনাথ আশ্রমের কাহিনী। তাই নয় কী দোলনা—"

—ঠিক বলেছেন লুটিদি। আমি ঘুঘুকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলুম বলে—দোলনা জবাব দেয়।

—ঘুঘু, সে আবার কে?

—না, না, ঘুঘু নয় মানে হলো গিয়ে,—ইয়ে, হৈ-চৈ তো ঘুঘু রিপোর্টার। তাই বলছিলাম কী আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন। আমি ওকে আজ বিকেলেই আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসছি। তারপর তুজনে পরামর্শ করে যজ্ঞের বক্তৃতা ও অনাথ আশ্রমের কাহিনীটা ঠিক করে রাখবো।"

বেশ খুশী মনেই এবার লুটিলুটি হালদার ক্যাফে ডু গ্রীল থেকে বিদায় নিলেন।

স্বামী খলিলানন্দের খোঁজে যে তিনি এসেছিলেন, এটা একদম ভুলে গেলেন।

'দোলনা, তুই আমার বন্ধু—' বেশ উদাস কণ্ঠেই ঘুঘুরাম দোলনাকে প্রশ্ন করলে।

দোলনা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে। দেখতে পেলে সেই দাড়িওয়ালা ইণ্টারন্যাশনাল গ্যাংস্টার উধাও হয়েছে। তাই একটু সাহস নিয়ে জবাব দিলে ঃ আলবাৎ।

—তা হ'লে তুই আমার নাম ভুল করলি কী করে। আমার বাপ-ঠাকুর্দার দে'য়া নাম, ঘুঘুরাম চৌধুরী, পিতার নাম ধড়িবাজ চৌধুরী, তস্য পিতা চালিয়াৎ চৌধুরী। বংশ কুলীন—। আর তুই কিনা সব ভুলে গিয়ে আমায় বানালি হৈ-চৈ পতিতুণ্ডি। কোথাকার কোন্ হেঁজি-পেজি রিপোর্টার—ছিঃ ছিঃ।

ঘুঘুকে সান্ত্বনা দিয়ে হৈ-চৈ বলে ঃ কেন তোর নাম পাল্টেছি জানিস। সেকসন 144 CRPC. চারিদিকে ঘোর বিপদ। ডার্কনেস অ্যাট নুন, ডার্কনেস ইন দি মর্ণিং। আর শুধু কী তাই—ডার্কনেস ইন লাইফ। তুই যদি আমার মতো বিপদে পড়তিস তা হলে আমি কী করতুম জানিস্। সিডনি কার্টুন হয়ে যেতুম।

—সেই বিখ্যাত ডিটেকটিভ তো—ঘুঘুরাম বলে।

—আরে না, না। সেই যে ফরাসী বিদ্রোহের সময় লোকটা একটা মেয়ের জন্যে নিজের জানটা দিলে।

আঁতকে ওঠে ঘুঘু দোলনার কথা শুনে। বলে ঃ বলিস কী রে দোলনা। তুই আমাকে তোর জন্যে নিজের জান দিতে বলছিস।

—আরে না, আমার জন্যে তোকে 'জান' দিতে বলছি নে। কিন্তু ভেলভেলেটাকে জানিস তো। লুটিদির ভাগ্নী ভেলভেলেটা

চক্কোত্তি। আমি চাইছি ভেলভেলেটার জন্যে 'জান' দিতে। একটু থেমে দোলনা বলে ঃ ঘুঘু রে, আমি প্রেমে পড়েছি।

—তুই—তুই, দোলনা প্রেমে পড়েছিস ?

হ্যাঁ। ভেলভেলেটার প্রেম-দরিয়ায় আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। বিদেশী কাগজের ভাষায় ঃ 'সী ফর দি ফিফ্‌থ টাইম এ্যাণ্ড আই ফর দি থার্ড টাইম'।

—এ আবার কী বলছিস্ রে দোলনা। কিছুই তো বুঝতে পারছিনে—ঘুঘুরাম বললে।

—শোন ঘুঘু। তোকে সব খুলেই বলছি! গত বছর 'জীবন আমার উতলা হোল' প্লে করতে গিয়ে আমি লুটিদির ভাগ্নী ভেল-ভেলেটার প্রেমে পড়ি। কিন্তু আসল ব্যাপার কী জানিস। আমাদের প্রেমের তলায় আণ্ডার-কারেণ্ট বইছে।

—মানে! সবিস্ময়ে ঘুঘুরাম বলে।

—মানে অতি সহজ ও সরল। ঐ ব্যাটা বুজরুক সন্ন্যাসী, স্বামী খলিলানন্দ, ঐ হতভাগাই আমাদের প্রেমে বাধা দিয়েছে। আমি গোপনে খবর নিয়ে জেনেছি যে ওর নজর রয়েছে ভেলুর উপর। তাইতো ও সকাল বিকাল লুটিদির পেছনে ঘুরঘুর করছে, আর আমার নামে যত নালিস করছে। লুটিদির কাছে আমার আর্জি পেশ করতে এ পর্যন্ত কতোবার গিয়েছি জানিস! কিন্তু কিছুতেই সুবিধে করতে পারছিনে, ঐ ধাপ্পাবাজ স্বামী খলিলানন্দের জন্য।

—বুঝতে পেরেছি দোলনা। তোকে রবার্ট ব্রুস হ'তে হবে। মানে ট্রাই-ট্রাই-ট্রাই এগেইন—জবাব দেয় ঘুঘুরাম।

—সে কী আর করি নি। অনেকবার করেছি। কিন্তু কিছুতেই 'রোড ক্লিয়ার' পাচ্ছিনে—

এবার কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে বললে ঃ শোন্ ঘুঘু, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। একটা গল্প বলছি তোকে শোন—

—গল্প ভূতের নয় তো !

—শোনই না—

দোকানের গদিতে বসে ঝুটালাল লুটেরমল ঝিমচ্ছিলেন। ওটা ঠিক আসল ঝিমুনি নয়—তিনি গভীর মন দিয়ে ভাবছিলেন।

সত্যি ব্যাপারটি ভাববার বটে। এক দুর্বল মুহূর্তে তিনি অনোখীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সেভেন্থ হেভেনের শেয়ারগুলো বিক্রি করবেন। ব্যস্, যেদিন বাজারে এই কথা রাষ্ট্র হয়ে গেলো সেদিনই শেয়ার মার্কেট চড়া হয়ে গেলো। সেভেন্থ হেভেনের শেয়ারের দাম 'ফোর্থ হেভেন' অবধি উঠে গেলো। দামটা যে এতো চড়ে যাবে এটা ঝুটালাল কল্পনা করেন নি।

কিন্তু আজ মুশকিলটা কোথায়। মুশকিলটা আর কিছু নয়, অনোখীর কাছে এতোগুলি সেভেন্থ হেভেনের শেয়ার বিক্রি করতে তাঁর মন চাইছে না। আর শুধু তাই নয়, শাদীলাল ছুচুন্দরের কাছে তিনি শুনেছেন যে অনোখী হয়তো তাঁকে শেয়ারের দামই দেবে না। তা হ'লে উপায় !

উপায় আর কী। অনোখীর কাছে শেয়ার বিক্রি না করা। কিন্তু সে কী করে সম্ভব! সমস্ত দেশশুদ্ধ জানে যে অনোখীলাল পখোটিয়া 'সেভেন্থ হেভেনের' শেয়ার কিনে নিচ্ছে। বাজারে এই শেয়ারের দাম বাড়বার এই একটা কারণ। এখন যদি সবাই জানতে পারে যে এর সব কিছুই ভুয়ো, তাহলে শেয়ারের দাম হু হু করে নেমে আসবে। আর শুধু তাই নয়, অনোখীকে সে কথা দিয়েছে যে তাকে সেভেন্থ হেভেনের ম্যানেজিং এজেন্সীর শেয়ার দেবে। এখন

বিক্রি না করলে মার্কেটে আর মুখ দেখাতে পারবে না। কারণ শেয়ার মার্কেট তো মুখের কথায় চলে।

কিন্তু কী করা যায়।

উপায় একটা তাকে বের করতেই হবে। আচ্ছা, একবার তার সলিসিটর্স ফার্ম বাটপারিয়া-বাটপারিয়া-বাটপারিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করলে হয় না!

আধঘণ্টা পরে ঝুটালাল লুটেরমল বিখ্যাত সলিসিটর্স ফার্ম বাটপারিয়া-বাটপারিয়া-বাটপারিয়ার দপ্তরে এসে ঢুকলেন।

বাটপারিয়া-বাটপারিয়া-বাটপারিয়া ফার্মের প্রধান অংশীদার গজানন বাটপারিয়া নিজের অফিসে বসে সচিত্র সিনেমা সাপ্তাহিক 'দিল কী রানী' পড়ছিলেন।

বলা বাহুল্য গজানন বাটপারিয়া সিনেমার একজন ভক্ত।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখেছেন যে তিনি অশোককুমার বা রাজকাপুর হবেন। এমনিতেও 'আখোঁ কা লাল' বলে বইতে একটি ছোট পার্টও করেছিলেন। পার্ট সামান্য ছিল বটে কিন্তু গজাননের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। গজাননের ছিল নায়কের ভৃত্যের পার্ট।

দেখানো হচ্ছিলো যে গজানন বাড়ির সামনে বসে আছে। পাওনাদারেরা এসে হিরোর অনুসন্ধান করছে। একজন লোক এসে জিজ্ঞেস করলো : হেঁই ?

গজানন জবাব দেয়—হেঁই।

—সাহব মকান আছে ?

—নহী আছে।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উল্‌টো দিক থেকে আর একটা লোক এলো। গজাননকে প্রশ্ন করলে : হেঁই ?

গজানন জবাব দেয়—হুঁই।

—সাহব মকান আছে ?

—নহী আছে।

কিন্তু একথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা প্রশ্ন করলো : তব্ কহাঁ আছে।

ডাইরেক্টরের সঙ্গে চুক্তি হবার সময় গজানন জানতো না যে তাকে এ প্রশ্ন করা হবে। তাই সে চটে গেলো। চটার আর একটা কারণও ছিল। বহুবার ইনকমট্যাক্স ওয়ালারা তাকে এ ধরণের প্রশ্ন করেছে। অতএব তার না চটে উপায় ছিল না। সে বললে : কহাঁ আছে হমে পুছিয়ে কী জরুরত আছে। ওহি শ্বালা ডাইরেক্টর বোসিয়ে আছে, উসে পুঁছিয়ে লিন।

গজানন এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ডাইরেক্টর চীৎকার করে উঠলেন···কাট—কাট—কাট।

ডাইরেক্টর চটে উঠলেন সত্য কিন্তু একটু পরেই তার হুঁশ হলো যে গজাননই এই ছবির প্রডিউসারের অন্যতম বন্ধু। যে-কোন মুহূর্তে গজাননের একটি কথায় ডাইরেক্টরের চাকরি যেতে পারে। অতএব গজাননের অপমান সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। এর পরে আর কোন ছবিতে গজাননের ডাক পড়ে নি।

বড়ো হয়ে গজানন সলিসিটর্স ফার্মে ঢুকলো সত্যি কিন্তু সিনেমার প্রতি ঝোঁক তার কমলো না। আইন-আদালতের ব্যাপারে সে কোনদিনই মাথা ঘামায় নি। কারণ পাঁচ-পাঁচটা কেস তার 'ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে' বুক করা আছে। অর্থাৎ পাঁচ বছর ধরে এ কেসগুলি চালানো যাবে, এ তিনি হলপ করেই বলতে পারেন। প্রয়োজন হলে 'সিকিণ্ড ফাইভ ইয়ার' প্ল্যানেও চালু করা যেতে পারে।

অভিনেত্রী নিম্মির জীবন-কাহিনী পড়তে পড়তে গজানন যখন খুব মশ্‌গুল তখন ঝুটালাল লুটেরমল এসে ঘরে ঢুকলেন।

—রাম, রাম গজাননবাবু।

—রাম, রাম—এই সময়ে ঝুটালালকে দেখে গজাননের মনটা খারাপ হয়ে গেলো। চিত্রাভিনেত্রীদের জীবনী পড়ার সময় গজানন কোন ব্যাঘাত পছন্দ করেন না। তাই ঝুটালালের আগমন তাঁর বিশেষ পছন্দসই হয় নি।

—গজানন বাবু আপসে থোড়ি সলাহ্‌ কী বাত ছিল—

না লোকটা জ্বালালে দেখছি। কিন্তু উপায় নেই। ঝুটালালকে চটিয়ে লাভ নেই। তাই একটু শুকনো মুখে গজানন প্রশ্ন করলেন : আলবাৎ সলাহ্‌ কোরবেন : ওহ্‌ তো সোরম কী বাত নহী আছে।

—গজাননবাবু অনোখী হমসে বোহুত ধোঁকাবাজি কোরিয়ে গেল—

—উত্তম কম্‌ কোরিয়েছে—' ফিল্মস্টার নিম্মির জীবনীর রেশ তখনও গজাননের কাটে নি। তাই সে একটু অন্যমনস্ক হয়েই জবাব দিলে। কিন্তু একটু বাদে বুঝতে পারলেন যে এ মন্তব্য করা তাঁর উচিত হয়নি। তাই একটু শুধরে নিয়ে বললেন—নহী, এহি কম্‌ ঠিক না আছে। আপ কেস কোরিয়ে দিন।

—কেস কোরিয়ে সুবিস্তা না হোবে গজাননবাবু। অনোখী শ্বালাকো হমি বোলিয়েছিলাম—এয়ার কোম্পানীকা কুছু শেয়ার বেচহিয়ে দেবো। আভি হমার মালুম হোইয়েছে যে ওহি শ্বালা পয়সা না দিবে। হমি উনহেকো শেয়ার না বেচবো—' ঝুটালাল বলেন।

—অনোখী আপকো নামে জোরুর কেস কোরিয়ে আপসে পোয়সা আদায় কোরিয়ে লিবে। 'ব্রীচ অব কনট্রাক্টকা' কেস।

—'কনট্রাক্ট ব্রিজ' হমভী জানি গজাননবাবু। হমি ভী উস্‌মে ওস্তাদ আছি।

—নহী, নহী, 'কনট্রাক্ট ব্রিজ' নহী। ইয়ে তো চারশো বিশকা বাত আছে ঝুটালালজী।

—নহী, নহী, ইয়ে চারশো বিশকা বাত নহী আছে। হমারী বাত তো শুনহিয়ে লিন। কোই রোজ পহেলে—

—কেতো রোজ পহেলে—' গজানন কথায় বাধা দিয়ে বলেন। কণ্ঠে আছে তাঁর রুক্ষতার আভাস কারণ এমন একটি মজাদার জীবন-কাহিনী থেকে নীরস ঘটনা শুনতে তাঁর কোন আগ্রহই নেই। তবু তাঁকে বাধ্য হয়ে সব শুনতে হচ্ছে। সলিসিটর্স ফার্মের অংশীদার হ'বার এই তো বিড়ম্বনা।

ঝুটালাল বলতে থাকেন ঃ শায়েদ দশ-পন্দ্রহ রোজ পহেলে হমে এক বঢ়িয়া হাওয়াই কোম্পানীকা কুছু শেয়ার মিললো—

—বোহুত উমদা বাত আছে—ঝুটালালজী ঃ গজানন বলেন।

—বাত উমদা নহী আছে গজাননবাবু। হমার কাছে এহি কোম্পানীর শেয়ার আসবার পহেলে কোই শ্বালা নহী জানতো যে এহি বঢ়িয়া শেয়ার আছে। কেতো রোজ নহী কোই শ্বালা খরিদ কোরিয়ে লিলো—

—তব তো বঢ়ি খরাব বাত আছে—দীর্ঘশ্বাস ফেলে গজানন বলেন।

—হাঁ, বাত জোরুর খরাব আছে। কোম্পানীর হালত দেখিয়ে হমার বোহুত দুখ হলো। হমি ঝাড়তি-পড়তি সব কোই শেয়ার খরিদ কোরিয়ে নিলাম। কোম্পানীকা সাইনবোর্ড ভী লাগাইয়ে দিলাম। তিন রোজমে গজানন সাহব মার্কিট বোহুত গোরম হোইয়ে গেলো।

—বড়ী তাজ্জব কী বাত আছে—গজানন বলে।

—নহী তো কী। হাঁ শুনহিয়ে ফিন। কোম্পানীকা শেয়ার কেতো বঢ়িহিয়ে গেলো। দশ রুপেয়াকা শেয়ার হাজার রুপেয়াভী হোইয়ে গেলো।

—রাম রাম ঝুটালালজী, শেয়ারকা দাম এতো বাড়াইয়ে দিলেন।

—হ্যাঁ। জোরুর কোরিয়ে দিলাম। আপতো জোরুর শুনহিয়ে থাকবেন, গজাননবাবু বিজনেস ইজ বিজনেস।

—তব বেফিকর রহিয়ে যান। কোই কুছু না বলবে ঃ গজানন জবাব দেয়।

—হাঁ গজাননবাবু, ইস্‌কে বাদ তো হমার এক বড়া কসুর হোইয়ে গেল। হমি অনোখীলালকো জবান দিলাম কী সবকোই শেয়ার উনহেকে বেচহিয়ে দেবো—

—বেচহিয়ে দিন।

—বেচহিয়ে দেবো।

—আলবাৎ।

—আপ সাচমুচ বোলিয়েছেন। গজাননবাবু অনোখী শ্বালা শেয়ার খরিদ করিয়ে আলবাৎ পোয়সা দেবে না।'

—গজানন কোন জবাব দিলেন না। একটু বাদে প্রশ্ন করলেন, ঝুটালালজী অনোখীর সলিসিটর্স কুন আছে।

—কুন আর হোবে। হামি তো শুনিয়েছি ঘুঘুরামবাবুসে উনহেকো বহুৎ দোস্তি আছে।

ব্যস, আর কথা নেই। গজানন চুপ করে গেলেন। ঘুঘুরাম তার বন্ধু, অর্থাৎ তাঁদের 'ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে'র একজন অংশীদার। কিছুদিন আগে কর্পোরেশনে এক প্রস্তাব এসেছিল যে ঘুঘু ও গজাননের যে রাস্তায় দপ্তর, সেখানে একটি 'রেড লাইট' দিয়ে দে'য়া

হোক, 'এ পথ দিয়ে জেলে যাবার সর্বোৎকৃষ্টম রাস্তা। নিয়মাবলীর জন্য ঘুঘুরাম চৌধুরী ঘুঘুরাম চৌধুরী ঘুঘুরাম চৌধুরী বা বাটপারিয়া, বাটপারিয়া বাটপারিয়া সলিসিটর্স ফার্মে আবেদন করুন'।

এবার একটু গম্ভীর হয়ে গজানন জবাব দিলেন : তব তো আপকো কোরিয়ে দিতে হবে ঝুটালালজী। ঘুঘুরাম যব অনোখীলালকো সলিসিটর্স আছে, তব তো বঢ়ী খরাব আছে।

—রাম, রাম, এতো দামী শেয়ার ছোড়িয়ে দেবো। এহি চীজ তো সোনেকা খনি আছে।'

এবার গজাননের বিস্ময়ের পালা। বলেন : আপ কী বোলছেন ঝুটালালজী, হম্ সমঝিয়েছিলাম এহি তো এয়ার কোম্পানীকা শেয়ার আছে।

—কৌই ফরক নহী, কৌই ফরক নহী। স্রিফ মিট্টি কা নীচে নহী, কভি কভি হাওয়ামে ভী সোনা হোইয়ে যায়, গজানন সাহেব—

—তবতো বহুত খরাব কম্ কোরিয়েছেন ঝুটালালজী, এহি শেয়ার আপকো অনোখীলালকে দিতে হবে। নহী তো ঘুঘুরামবাবু আলবাৎ ব্রীচ অফ কন্ট্রাক্ট কোরিয়ে দিবে।

তারপর বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ। একটি পেনসিল দিয়ে ঝুটালাল একটি কাগজে দাগ কাটছিলেন। নিজের অজ্ঞাতসারেই লিখলেন : অনোখীলাল পয়লা নম্বরের···

ঝুটালালের হাতের লেখা খারাপ। অতএব এর পরের শব্দগুলো পাঠ করা সহজ নহে। আর বিশেষ করে মন প্রসন্ন না থাকলে ঝুটালালের হাতের লেখা ভালো হয় না। সে জন্যই তো মন খারাপ থাকলে সে ইনকম্‌ট্যাক্সের খাতা লিখতে শুরু করে দেয়।

আজ তার সলিসিটর্স গজানন এইভাবে যে 'দরিয়ায়' ভাসিয়ে দেবে এ ঝুটালাল আশা করে নি।

হঠাৎ গজানন এক চীৎকার করে উঠলো। চম্‌কে গেলো ঝুটালাল। গজাননের মাথায় প্ল্যান এসেছে।

—ঝুটালালজী ?

—গজাননবাবু।

—আপ জোরুর জানেন কী অনোখীলাল আপকো ধোঁকা দিবে। শেয়ার খরিদ করিয়ে পোয়সা দিবে না।

—আলবাৎ না দিবে। ওহি শ্বালা জিন্দীগে মে কভি কিস্‌কো পোয়সা না দিয়েছে।

—তবতো আপ ভী শেয়ার না দিবেন।

—আগর, অনোখী কন্‌ট্রাকট্‌ 'ব্রিজ' কোরিয়ে দেয় তো ?

—শুনহিয়ে লিন হমারী বাত। 'বাগদাদ কী খেল' তসবীর আপ দেখিয়েছেন ?

—নহী জী।

—হাঁ উস্‌মে এক বঢ়িয়া খেল আছে। ডাকু যব দলিল চুরি কোরিয়ে নিলো, তিন রোজ বাদ দেখলো কী উস্‌মে কুছু ভী না লিখা আছে—

—রাম, রাম গজাননবাবু। বঢ়ী তাজ্জব কী বাত আছে ; আপ ভী হমকো 'বাগদাদ কী খেল' শিখলাইয়ে দিন।—ঝুটালাল বলেন।

—আপ এক কম্‌ কোরিয়ে লিন ঝুটালালজী। 'ভ্যানিশিং ইঙ্ক' মে আপ দলিল সহি কোরিয়ে দিন। তিন রোজ বাদ উসমে আপকো সহি ভী না থাকবে। শেয়ার ভী বেচহিয়ে দিলেন, মাল ভী আপকো রহিয়ে গেলো—'

কথাটা মন্দ বলেনি গজানন। অনোখীলালকে বিশ্বাস নেই। ভ্যানিশিং ইঙ্ক দিয়ে শেয়ারের কাগজপত্র সই করলে, রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে। তাই খুশী হয়ে ঝুটালাল বলে ঃ গজাননবাবু

আপ বোহুত উত্তম বাত বোলিয়েছেন। অনোখীলাল হমে ধোঁকা বাজী দিবে তা, হমি ভী 'বাগদাদ কী খেল' দেখলাইয়ে দেবো। আর কুছু না ভাববেন।"

আশ্বস্ত হয়ে ঝুটালাল চলে গেলেন। গজানন এবার ভাবতে বসলেন। সত্যিই ঝুটালাল ভ্যানিশিং ইঙ্কে দলিল সই করলে কী মজাটাই না হবে। অনোখী যখন টের পাবে তখন নিশ্চয় কেস ঠুকে দেবে ব্যাটার নামে। আর একটা কেসের মেয়াদ তো কম্‌সে কম পাঁচ বছর, প্রয়োজন হলে আরো পাঁচ বছর। না, কথাটা ঘুঘুরামকে জানানো দরকার। 'সিকিণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে' এ কেস ঢুকিয়ে দিতে হবে।

কাগজ কলম নিয়ে গজানন ঘুঘুরামকে চিঠি লিখতে বসলো।

তিনদিন বাদে অনোখীলাল পখোটিয়ার বাড়ির ড্রয়িংরুমে বসে দোলনা সেন ও ভেলভেলেটা চক্কোত্তীর কথা হচ্ছিল।

দোলনা বললে ঃ ভেলু!

ভেলভেলেটা বসে বসে আইসক্রীম খাচ্ছিলো। আইসক্রীম তার প্রিয় জিনিস। খাওয়াতে বাধা পড়ায় সে রুক্ষ মেজাজে জবাব দিলে—

কীঁই.........

—আমি বলছিলুম কী ?

—কী বলছিলে—আবার কর্কশ কণ্ঠে ভেলভেলেটা বলে।

—বলছিলুম কী,—মানে আসল কথা কী জানো, কোকিলের কুহু কুহু ডাক শুনতে পাচ্ছি কেন ?

—তুমি পাগল হয়েছো দোলনা। এই জষ্ঠি মাসে কোকিল আসবে কোত্থেকে শুনি।

—বাইরে নয়, ভেলু, বাইরে নয়। মানে আমার মনের ভেতর থেকে যেন কোকিলের কুহু কুহু রব শুনতে পাচ্ছি।

—ডাক্তার দেখাও। নিশ্চয়, ম্যালেরিয়া হয়েছে।

—ম্যালেরিয়া। কী বল্লে। নাঃ, নাঃ, ভেলু এ অসুখ সারানো ডাক্তার বদ্যির কাজ নয়। আমি বলছিলুম কী—

এবার ভেলভেলেটার ধৈর্যচ্যুতি হলো। সে এবার একটু রাগ করেই জবাব দেয়ঃ তোমার যা বলবার তা বহুবার শুনেছি। নতুন যদি কিছু ব'লবার থাকে তো বলো।'

দোলনার মনে হলো যেন যে জ্যৈষ্ঠ মাসেও বরফ পড়ে। নইলে এমনি কর্কশভাবে ভেলভেলেটা জবাব দেবে কেন। তাই কথার মোড় ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করলে। বললেঃ সেদিন কী হয়েছিল জানো? ভয়ানক ব্যাপার।

—জানি। বলবে তো জীবন তোমার উতলা হয়েছে কিংবা দোলন চাপায় কাঁপুনি এসেছে। ওকথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।

—নাঃ নাঃ, দোলনা সেন সজোরেই বলে। তরশু বিকেলে ক্যফে গ্রীলে সেই যে দেখলাম ইয়া গালপাট্টা দাড়িওয়ালা এক গুণ্ডা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—

—দাড়িওয়ালা গুণ্ডা! বলো কী দোলনা—আইসক্রীমে শেষ কামড় দিয়ে ভেলভেলেটা একটু নড়ে চড়ে বসলো।

—হ্যাঁ গুণ্ডা। চীনে বাজারের, কিন্তু ঘুঘু বলছিল যে গুণ্ডাটা বিলেত-ফেরতও হতে পারে। মানে কিনা ইণ্টারন্যাশনাল গাংস্টার আর কী?

—ঘুঘু! সে আবার কে?—

এবার ভেলভেলেটার বিস্ময়ের পালা।

—আরে ঘুঘু নয়, মানে আমাদের রিপোর্টার হৈ-চৈ পতিতুণ্ডি। ওতো ঘুঘু রিপোর্টার। তাই সবাই ওকে ঘুঘু বলে ডাকে।

উত্তেজনায় ভেলভেলেটার চোখ দুটো যেন নেচে উঠলো। গুণ্ডার নাম শুনলেই সে বেশ উত্তেজনা অনুভব করে। কারণ মাত্র কিছুদিন আগে তার দুই বান্ধবী এমনি রকম এক ডাকসাইটে গুণ্ডার খপ্পরে পড়েছিল। কিন্তু বান্ধবী দুটো সে গুণ্ডাকে এমনি রকম চমক লাগালে যে গুণ্ডা নাকে কানে খত দিয়ে বলেছে যে জীবনে আর সে কখনও মেয়েদের পেছু নেবে না। তাই সে প্রশ্ন করলে ঃ তুমি বুঝি খুব ক' ঘা লাগালে গুণ্ডাটাকে ?

—না ! না ! আমি দেশের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলুম না। কারণ সেদিন হোম মিনিস্টার বলছিলেন দেশের আইন শৃঙ্খলার ভার সরকারের।

ভেলভেলেটা শুধু সংক্ষেপে বললে ঃ কাপুরুষ !

দোলনা সজোরেই বলে ঃ আমি জানি গুণ্ডাটা কাপুরুষ। একটু বাদেই সে অমনি টেবিল ছেড়ে পালালে।

জবাব দেয় ভেলভেলেটা। বলে ঃ না না, গুণ্ডা কাপুরুষ হতে যাবে কেন। কাপুরুষ তুমি !

—আহা তুমি বুঝি ভাবছো আমি ভয় পেয়েছিলুম। একটুও না আমি গিয়ে কী করলুম জানো। সোজা গিয়ে হৈ-চৈ পতিতুণ্ডিকে ডেকে আনলুম।

দোলনার কথায় ভেলভেলেটা খুশী হলো কিনা তার জবাব শুনে বোঝা গেলো না। সে বললে ঃ নিজে শায়েস্তা করতে পারলে না। হৈ-চৈ কে ডাকতে গেলে কেন ?

—বাঃ রে এসব ব্যাপারে হৈ-চৈ কতো ওস্তাদ জানো। তুমি ওর 'শত্রু সমরে নারী' পড়েছো। আর সেই 'সম্মুখে সমরে পড়ি' কবিতাটা।'

ভেলভেলেটার উত্তেজনা যেন বাড়তে লাগলো। সে জবাব দিলে। বললে ঃ হৈ-চৈ বাবুই 'শত্রু সমরে নারী' লিখেছিলেন। কী অবাক কাণ্ড! উফ্ কী চমৎকার বই-ই না লিখেছেন!

ভেলভেলেটার মুখে হৈ-চৈ-র প্রশংসা শুনে দোলনা সেন যেন একটু ক্ষুব্ধ হলো। তাই একটু অনুযোগের কণ্ঠ নিয়ে বললো ঃ হৈ-চৈ লিখেছিলো বটে কিন্তু ইনস্পিরেশন কে দিয়েছিল জানো, এই আমি! কিন্তু যাক আসল কথাটাই যে বলি নি। আমার কী মনে হয় জানো। আমার পেছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছে ঐ তোমার ধাপ্পাবাজ স্বামী খলিলানন্দ।

—ওমা সে কী কথা গো! স্বামী খলিলানন্দ আবার তোমার পেছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দেবে কেন?

ঃ আলবাৎ দেবে। না দিয়ে উপায় কী বলো। পথের কাঁটা সরাতে চায় আর কী! আমি হলুম গিয়ে ওর সেই কাঁটা ভেলু।

একথার জবাব ভেলভেলেটা দেয় না! চুপ করে থাকে। দোলনাই বলে চলে ঃ ভেলু, মোদ্দা কথা জানো তোমার ঐ স্বামী খলিলানন্দ তোমার প্রেমে পড়েছেন। তাইতো উনি আমায় দেখতে পারেন না। খালি দিনরাত ভাবছেন কী করে আমায় তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেন। রোজ লুটিদির কাছে আমার নামে কতো নালিস করে জানো! ওর আসল উদ্দেশ্য হলো লুটিদির মন আমার প্রতি বিষিয়ে দেয়া।

ভেলভেলেটার মনে হলো সে যেন মোহন সিরিজের শেষ অধ্যায় পড়ছে। কারণ এরকম বিস্ময়কর ঘটনা সচরাচর সে শোনে নি। এক দোলনার পেছনে ইন্টারন্যাশনাল গ্যাংস্টার লেলিয়ে দেয়া; দুই, স্বামী খলিলানন্দের তার প্রতি প্রেম।

এবার সে বললে ঃ হুম, এবার সব বোঝা গেছে!

দোলনা সেন তো অবাক। সে বলেঃ সে কী ব্যাপার। কী বুঝলে।

কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে ভেলভেলেটা জবাব দিলেঃ দোলনা, এবার সব 'কৃষ্টাল ক্লিয়ার'! খলিলানন্দ স্বামী সত্যিই আমার প্রেমে পড়েছেন। কাল উনি কী করছিলেন জানো। বসবার ঘরে বসে 'ধর্মের উপর নারীর প্রভাব' বইটা মুখস্থ করছিলেন।

—তুমি ঠিক বলছো ভেলু—চীৎকার করেই দোলনা বলে।

—ঠিক বলছি।

—তা হ'লে বলতে চাইছো যে ওর গেরুয়া বসন সত্যিই গেরুয়া বসন নয়। ওটা হলো গিয়ে বাসন্তী রং।

—তাই তো মনে হচ্ছে—ভেলভেলেটা জবাব দেয়।

—আমিও ভাবছি—দোলনা সেন যেন একটু গম্ভীর হয়ে পড়ে।

এমনি সময় ঘরে ঢুকলেন লুটিলুটি হালদার। পাশের ঘরে বসে তিনি একটি পুরনো চ্যারিটি শো'র একাউণ্ট দেখছিলেন, কিছুতেই হিসাব মিলছিল না। কিন্তু দোলনা সেন ও ভেলভেলেটার চীৎকারে তার হিসেবে আর মন বসছিল না।

—একী ব্যাপার হচ্ছে শুনি। ষাঁড়ের মতো চীৎকার করছো কেন ?—

লুটিলুটি হালদার প্রশ্ন করলেন।

—আমি গান গাইছিলাম লুটিদি—দোলনা সেন জবাব দেয়।

—গান নয় লুটিমাসী। দোলনবাবু বলছিলেন যে ওর পেছনে না-কি স্বামী খলিলানন্দ গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছে—ভেলভেলেটা বললে।

—ছিঃ ছিঃ দোলনা। দিন দিন তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি কী হচ্ছে শুনি। তুমি স্বামী খলিলানন্দের নামে বলছো, কাল হয়তো আমার নামে বলবে—

—অলরেডী বলেছে লুটিমাসী। বলছিল কী তোমার মন নাকি ওর উপর বিষিয়ে আছে—

—দোলনা!. গম্ভীর কণ্ঠে লুটিলুটি হালদার বললেন। দেখতে পাচ্ছি তোমার জন্মেই আমার অনাথ আশ্রমের টাকা আর উঠবে না। আমাদের নামে যদি এ সব যা-তা বলে বেড়াও তা হ'লে কী আর লোকে টাকা দেবে। কেউ দেবে না, এই তো পাশের ঘরে বসে হৈ-চৈ বাবু আমার অনাথ আশ্রমের উপর প্রবন্ধ লিখছেন। হয়তো আমাদের নামে অপবাদ শুনলে উনি আর লিখতেই চাইবেন না। একটু বাদে স্যর গটগটি মিটার ও ঝুটালাল লুটেরমল আসছেন। উফ্ স্যর গটগটির কানে যদি এসব কথা ওঠে তা হ'লে কী বিশ্রী কাণ্ডই না হবে। যদি স্যর গটগটি জানতে পারেন—

কথাটা শেষ হলো না তার আগেই চাকর এসে বললে : সাহব গটগটি আয়া হ্যায় জী। উনহেকো অন্দর-লে আঁউ—

চাকরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্যর গটগটি ওরফে বাইভি এসে ঘরে ঢুকলেন।

স্যর গটগটিকে দেখে দোলনার মাথা ঘুরতে লাগলো।

না আর সন্দেহ নেই। সত্যিই ইণ্টারন্যাশনাল গ্যাংস্টার তার পিছু নিয়েছে। দোলনার মনে হলো যে ব্যাপারটা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে।

নিজের ঘরে বসে ঘুঘুরাম ভাবছিল এবার কি করা যায়। দোলনা যে তাকে এমনি ফাঁদে ফেলবে এ সে কল্পনা করে নি। সে চিন্তা করছিল কী করে লুটিলুটি হালদারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

চিন্তার আর একটা কারণ আছে। কাল সে তার বন্ধু গজানন বাটপারিয়ার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছে যে শীগ্‌গিরই একটা বেশ বড়ো রকমের মামলা বাধবার সম্ভাবনা আছে। বাটপারিয়ার মক্কেল ঠিক হয়ে গেছে—এবার ঘুঘুরাম যেন সজাগ থাকে অর্থাৎ এই কেসের কথা স্মরণ রেখেই যেন ঘুঘুরাম তার 'ফাইভ ইয়ার প্ল্যান' তৈরী করে। এই ছিল বাটপারিয়ার অনুরোধ।

বাটপারিয়ার এই হেঁয়ালী চিঠির তাৎপর্য ঘুঘুরাম ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। শুধু শঙ্কা হচ্ছে অনোখীলাল পখোটিয়াকে। লোকটা কী রকম জাহাঁবাজ, এ বিশ্বসুদ্ধ সবাই জানে। আর আজ সে এই বাড়ির অতিথি। তা হলে কী—

অনোখীর বাড়িতে এই আত্মগোপন করে থাকার একটা সুবিধে আছে। সেইটে আর কিছু নয়, মক্কেলের হাত থেকে রেহাই পাওয়া। আত্মগোপন করে থাকার এইটে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা, এটা ঘুঘুরাম জানে। অন্ততঃ 'জালনারী', 'রক্তপাঞ্জার ছাপ' বইতে এই নির্দেশ দেয়া আছে।

ক'দিন ধরে ঘুঘুর মনে হয়েছে এ বাড়ির সবারই চালচলন যেন রহস্যজনক। এরকম ক্ষেত্রে কোন গোয়েন্দার প্রতিভাই যে লুপ্ত থাকতে পারে না এ বলা বাহুল্য।

অতএব ঘুঘুরামও যে তৎপর হয়ে উঠবে, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে কী?

একটু বাদেই সে কর্মতৎপরতার পরিচয় দিলে।

বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করার পর ঘুঘুরাম রাস্তায় বেড়াতে বেরুলো।

অন্ধকারের আবছায়াতে লোকজন খুব স্পষ্ট করে চেনা যায় না। ঘুঘুরাম দেখতে পেলে তার দিকে একটি মূর্তি এগিয়ে আসছে।

ঘুঘুরামের কাছে এসে লোকটা থম্‌কে দাঁড়ালে। ঘুঘুরামের কাছে তার গতিবিধি বেশ সন্দেহজনকই বলে মনে হলো।

—ও মশায় শুনুন—লোকটি এসে ঘুঘুরামকে প্রশ্ন করলে।

ঘুঘুরাম থম্‌কে দাঁড়ায়।

—আচ্ছা, অনোখীলাল পথোটিয়ার বাড়ি কোন্‌টা বলতে পারেন কী?—আবার প্রশ্ন করে লোকটি। তার গলার কণ্ঠস্বর যেন সন্দেহ-জনক ঠেকছে। রহস্য যেন বেড়ে উঠছে।

—কার বাড়ি বললেন?

—আজ্ঞে, অনোখীলাল পথোটিয়ার। জানেন কোথায় থাকে?

এবার তার ডিটেকটিভের নির্দেশ স্মরণ হলো:

'নিজের খবর নিজের কাছে রাখ, পরের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ, চোর ও জুয়াচোর নজদীগই আছে—' এই কথাইতো স্পষ্ট লেখা আছে 'রক্তপাঞ্জার ছাপ' বইতে। তাই ঘুঘুরাম প্রশ্ন না করে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে: হুম, অনোখীলালের বাড়ি খুঁজছেন, কিন্তু কাকে চাই?

—বলেন কী ম'শায়, আমি কে তা জানেন না—

তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—ওঃ বাই জোভ্‌ আমি কে তাইতো আপনাকে বলি নি। আরে ম'শায় আমি হলুম গিয়ে 'হৈ-চৈ পতিতুণ্ডি'। 'ধাপ্পা সমাচারের' প্রত্যক্ষদর্শী, আই মীন একমাত্র রিপোর্টার। সব কিছুই রিপোর্ট করি। মায় রেস থেকে শুরু করে যজ্ঞ অবধি। অনোখীলাল শুনেছি একটা যজ্ঞ করছে। সেইটে রিপোর্ট করতে তো আসা—

হৈ-চৈর কথা শুনে ঘুঘুরাম স্তম্ভিত হয়ে গেলো। এখন যদি লুটিলুটি হালদার জানতে পারেন যে ঘুঘুরাম জাল হৈ-চৈ পতিতুণ্ডি তা'হলে ভবিষ্যৎটা কি হবে এ ঘুঘুরাম বলে দিতে পারে। স্রেফ

জেল—তারপর বাটপারিয়া যদি তার সলিসিটর্স হয়, তাহলে দীপান্তর কিংবা ফাঁসি। ঘুঘুরাম ও তার মক্কেলকে একই দিনে দড়িতে ঝুলতে দেখা যাবে।

এক মুহূর্তের মধ্যে এই ধরনের বহু চিন্তা ঘুঘুর মাথায় খেলে গেলো। কিন্তু তবু তার মনে হলো লোকটাকে যাচাই করে নেয়া দরকার।

প্রশ্ন করলে ঃ আপনিই সেই 'সম্মুখে-সমরে পড়ি—'

কথাটা শেষ হবার আগেই হৈ-চৈ করুণ আর্তনাদ করে উঠে। বলে ঃ পাগল হয়েছেন, 'সমরে' আমি কখনই যাইনি।

—না, না, যুদ্ধে যাবার কথা বলছিনে। জিজ্ঞেস করছিলুম আপনিই বুঝি সেই 'সম্মুখে-সমরে পড়ি' লিখেছিলেন।

—না না, আমি কক্ষনো যুদ্ধে যাইনি। আসল কথা কী জানেন, আমার 'ভরা শীতের' ইন্সপিরেশন যখন আসে—

—আপনি শীতকালে বুঝি কবিতা লেখেন? তা ঐ ঠাণ্ডার মধ্যে আপনার প্রেরণা আসে—?

—শুনুন স্যর আপনি যখন জিজ্ঞেস করছেন, তখন আপনাকে সব খুলে বলছি। দেখবেন আর কাউকে যেন বলবেন না। আমাদের 'ট্রেড সিক্রেট' কিনা। আসলে কী জানেন। ভরা বসন্তে আমাদের বাংলাদেশের কবিরা তৎপর হয়ে ওঠেন। ওদের জ্বালায় আমার কবিতা কোথাও ছাপা হয় না। শীতকালে সবাই যখন কুঁকড়ে থাকে তখন আমি এন্তার কবিতা লিখি। 'বে-টাইমে' একবার কবিতা লিখে আমার কী বিপদ হয়েছিল জানেন। চাকরি খোয়াই আর কী?

সবিস্ময়ে ঘুঘুরাম প্রশ্ন করে ঃ সে কী ব্যাপার?

—হ্যাঁ, ম'শায় সে দুঃখের কথা আর বলবেন না! আসল

ব্যাপারটা কী জানেন। একটা কবিতা লিখে 'ধাপ্পা সমাচার'-এ পাঠিয়ে দিলুম। কবিতাটা ছাপা হয়ে গেলো। আমার কবিতা পড়ে মালিক তো প্লীজড্। বললেন : 'আহা কী চমৎকার আইডিয়া। 'গুলবার্তা'র মালিককে বেশ একহাত নিয়েছেন। আপনি আসুন, চাকুরী নিন আমার দপ্তরে।' আমি নিলাম।

—মজার ব্যাপার কী জানেন। সেইদিন বিকেলবেলা 'গুলবার্তা'র দপ্তরে আমার তলব হলো। মালিক আমায় বললেন : বলিহারী আপনার আইডিয়া। ঐ ছুঁচো 'ধাপ্পা সমাচার'-এর মালিকটাকে নিয়ে যে ঐ ধরনের কোন কবিতা লেখা যায়, এ আমি কক্ষনো ভাবতে পারি নি। সত্যিই আপনার কবিতায় নতুন সুর আছে। চাকরি করবেন আমার ওখানে। কাজটা কিছু নয়। এই ম্যুনিসিপাল ইলেকসনে আমার হয়ে ঐ 'ধাপ্পা সমাচার'-এর বিরুদ্ধে গদ্য কবিতা লিখে দেবেন।

হৈ-চৈ-র কথা শুনে ঘুঘুরাম থ' খেয়ে গেলো। কবিতা লিখে যে চাকরি পাওয়া যায় এটা তার কাছে নতুন শোনাল। বিশেষ করে সংবাদপত্র দপ্তরে।

তাই একটু বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলে : বলেন কী ? এ তো তাজ্জব ব্যাপার দেখছি। কবিতার মানে কেউ বুঝলে না।

হৈ-চৈ বলে : আরে মশাই কবিতাই যদি বুঝবে তাহলে ইস্কুল মাস্টার হবে—খবরের কাগজে আসবে কেন। হ্যাঁ, তারপর কী বলছিলাম, একবার বসন্তকালে আমার প্রেরণা হলো। পাওনাদারেরা অনেকদিন ধরেই তাগিদ দিচ্ছিল, তাই অনুপ্রেরণা বেশ একটু তাড়াতাড়িই এলো। একটা কবিতা ছাপলাম 'ধাপ্পা সমাচার'-এ। ব্যস্ যেই কবিতা ছাপা হয়ে গেলো, দপ্তরে রীতিমতো সোরগোল পড়ে গেল। মালিক তো রেগে কাঁই। বললেন : 'এটা নিশ্চয় তার

মেজো শালীকে নিয়ে লেখা হয়েছে।' আমি যতোই অস্বীকার করি, উনি ততোই রেগে যান। আর ইদিগে 'গুলবার্তা'র মালিক তো কবিতা পড়ে কোর্টে যান আর কী। উনি নাকি সন্দেহ করছেন, যে কবিতা তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে। সে এক তুমুল কাণ্ড। 'ধাপ্পা সমাচার'-এর কর্তা বলেন, চাকরি থেকে তাড়াবো—'গুলবার্তা'র মালিক বল্লেন, আদালতে যাবো! কিন্তু আমার কপালটা ভালোই ছিল বলতে হবে, কারণ এই ঝগড়া করতে করতে বর্ষা এসে গেলো! আমি সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলাম। দু'দলের মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

এই কাহিনী বলতে বলতে হৈ-চৈ এবার একটু থেমে যায়। বলে: এই দেখুন, গল্প করতে করতে আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছিলাম। কৈ বল্লেন না তো অনোখীলাল পখোটিয়ার বাড়িটা কোথায়।

গল্প শুনতে শুনতে ঘুঘুরামের আতঙ্কও বেশ কমে গিয়েছিল কিন্তু হৈ-চৈর প্রশ্ন শুনে সে আবার শিউরে উঠলো। না, লোকটা গোল বাধাবে দেখছি। নাঃ, কোন উপায়ে একে তাড়াতে হবে। কী করা যায়! হঠাৎ তার মাথায় একটা প্ল্যান এসে গেলো। চট করে সে বলে বসলো—দেখুন, আপনার একটু আগেই দেখলুম আর একটা কাগজের রিপোর্টার ঐ বাড়িতে গেলো। নিশ্চয় ঐ 'গুলবার্তা'র রিপোর্টার হবে।

বিস্ময়ে আকাশ থেকে যেন পড়ে হৈ-চৈ। এখানেও 'গুলবার্তা'! না এই প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজটা তাকে ডোবাবে দেখছি। তাই সে বেশ একটু করুণকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—আপনি ঠিক জানেন যে 'গুলবার্তার' রিপোর্টার এর মধ্যে এসে গেছে।

—ঠিক জানি মানে আমাকে ঐ আপনি যা প্রশ্ন করেছেন ঐ কথাই জিজ্ঞেস করলে। বিশ্বাস না হয় অনোখীর বাড়ির দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করুন না?

—সত্যি এ যে বড্ডো দুঃসংবাদ দিলেন আপনি। কী জানেন, আমায় নিউজ এডিটার ডেকে বললেন, 'হৈ-চৈ তোমায় 'ইস্কুপ' করতে হবে।' আমি জবাব দিলাম, 'একটা কেন স্যর হাজারটা করতে পারি।' তিনি বললেন, 'না হে, এবার ইস্কুপ মানে একটু রাহাজানি করতে হবে। অর্থাৎ অনোখীলাল দেশনেতা হবার সংকল্পে যে বক্তৃতাটা দিচ্ছে, ঐটে আমরা চব্বিশ ঘণ্টা আগে ছাপাবো। আমি খবর পেয়েছি, কবি দোলনা সেন ঐ স্পীচ লিখে দিচ্ছেন। অনোখীর বাড়িতে গিয়ে তোমার ঐ স্পীচটা হাতড়াতে হবে।' তাইতো এসেছিলুম। কিন্তু আপনি যখন বলছেন 'গুলবার্তা'র রিপোর্টার এসে ঐখানে আস্তানা গেড়েছে, তার মানে ঐ স্পীচের ইস্কুপ ঐ 'গুলবার্তা' করবে দেখতে পাচ্ছি।

বলতে বলতে হৈ-চৈ-র একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তারপর একটু বাদে প্রশ্ন করলে: তা হলে কী করি বলুন তো ?

ঘুঘুরামের যে সঙ্কট মুহূর্তে বুদ্ধি খোলে তার প্রমাণ ঘুঘুরাম এবার পেলে। সে চট্ করে বলে বসলো: অহো, আপনার বিপদটা এবার বুঝতে পেরেছি। অর্থাৎ, আপনাকে যদি 'গুলবার্তা'র রিপোর্টার ঐ বাড়িতে দেখতে পায় তা হলে একটা কুরুক্ষেত্র হ'বার সম্ভাবনা আছে। কী বলেন ?

—কুরুক্ষেত্র নয় স্যর, দক্ষযজ্ঞ।

—তা' হলে আমি বলি কী আপনার আর ঐ বাড়িতে বর্তমানে না যাওয়াই শ্রেয়।

—ঠিক বলেছেন। 'গুলবার্তা' অনেকদিন ধরে আমাদের পেছনে লেগে আছে। না, ব্যাপারটা সিরিয়াস হয়ে উঠলো দেখছি। নিউজ এডিটার চটকবাবুকে খবরটা দিই গে।

হৈ-চৈ চলে গেলো।

ঘুঘুরামের যেন ঘাম ছাড়লো।

মনের আনন্দে শিস্ দিতে দিতে ঘুঘুরাম এসে বাড়িতে উপস্থিত হলো। এতো বড়ো একটা ফাঁড়া যে তার এমনি ভাবে কাটবে এ সে কখনও কল্পনা করে নি। কিন্তু বাড়ির দ্বারপ্রান্তেই তার দোলনার সঙ্গে দেখা। দোলনা যেন ভয়ে কাঁপছে।

দোলনার মুখে ঘুঘুরাম শুনতে পেলো যে সেই 'ক্যফে দ্য গ্রীলে'র ইন্টার ন্যাশলাল গ্যাংস্টার তাদের এখানে ধাওয়া করেছে।

না ব্যাপারটা ক্রমশঃই জটিল হয়ে উঠছে দেখছি। ঘুঘুরাম ভাবতে লাগলো। তা হলে কী তার সেই মক্কেল লোক লাগিয়েছে।

নকল দাড়ি অনেকক্ষণ ধরে পরে থাকার দরুণ স্যর গটগটি ওরফে সাহেব বাইভি বেশ অসোয়াস্তি অনুভব করছিলেন। নিজের ঘরে এসে দাড়ি-গোঁফটা খুলে ফেললেন। তারপর আয়নায় নিজের মুখ দেখতে লাগলেন।

না সত্যিই এই নকল দাড়িটা পরে থাকলে তাকে কী বীভৎস না দেখায়। কিন্তু দাড়ি না পরে কী উপায়। ছকু শাদীলালকে যে কথা দিয়েছে যে যেমনি করেই হোক অনোখীলালের দেশনেতা হওয়া সে বন্ধ করবে। ছদ্মবেশ না ধরলে পর সে কী আর অনোখীর বাড়িতে আসতে পারতো। দরোয়ানই তাকে ফটক দেখিয়ে দিতো। শুধু মাত্র বন্ধুদের জন্যে তাকে এই অভিনয় করতে হচ্ছে। সাধে কী লোকে বলে অসৎ সংসর্গ ত্যাগ করা উচিত।

আর অনোখীরই বা কী কাণ্ড!

বেশ তো ছিলি ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে। নয় কয়েকবার গনেশ উল্টিয়েছিলি। সারাটা জীবন তো তাদের সঙ্গেই কাটিয়ে এলি।

আর তোর কিনা আজ দুর্মতি হয়েছে তুই সবার কীর্তি ফাঁস করবি। আর করবিই যদি ঠিক করলি তা হলে তো ছকু শাদীলাল এরাই ছিল। বাইভিকে নিয়ে টানাটানি কেন? আর শুধু কী তাই? অনোখীর এই দেশনেতা হবার গূঢ় উদ্দেশ্য কী, সে কী তার জানা নেই, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গভীর ভাবে বাইভি এই চিন্তা করছিল। অনেকটা অন্যমনস্ক হয়েই। হঠাৎ শার্সীতে দেখতে পেলো আর একজনের পরিচিত মুখ।

তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং ঝুটালাল লুটেরমল।

বাইভি এ বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত বাড়িময় রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল যে বিখ্যাত উদারনৈতিক নেতা ধনকুবের স্যর গটগটি মিটার এসেছেন।

কথাটা ঝুটালাল লুটেরমলের কানে এসে পৌঁচেছে। আগের দিন ঝুটালাল এ বাড়িতে এসেছে। সংকল্প, অনোখীর সঙ্গে শেয়ার বিক্রির ব্যাপার নিয়ে একটা রফা করতে।

স্যর গটগটি এ বাড়িতে এসেছেন জেনে ঝুটালাল তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। স্যর গটগটির নাম শোনার চাইতে সে টাকার অঙ্ক শুনে বেশী আকৃষ্ট হয়েছিল।

যেমনি ভাবা, তেমনি কাজ। এক মুহূর্ত দেরি করলে শেয়ার মার্কেটের কোথায় গিয়ে তাকে দাঁড়াতে, হবে এ ঝুটালালের জানা আছে।

ঝুটালালের মনে হলো মাত্র কিছুদিন আগে ছকু ভাস্থু তাকে 'মাসরুম ভেজিটেবিল' কোম্পানীর কিছু শেয়ার বিক্রি করতে দিয়েছিলেন। আচ্ছা, স্যর গটগটিকে পাকড়ালে কেমন হয়। তিনি তো টাকার কুমীর। যদি শেয়ারগুলোর একটা হিল্লে করা যায়, তা

হলে একঢিলে দু'পাখী মারা যাবে। তার রথও দেখা হবে, কলাও বেচা হবে।

আজ গটগটির নাম শুনে ঝুটালালের মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। এইবার ঠিক মক্কেল পাওয়া গেছে। কোটীপতি স্যর গটগটি, চাট্টিখানি কথা নয়। এক্ষুনি গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। নইলে হয়তো অনোখী গিয়ে তার উদ্দেশ্য বানচাল করে দেবে। ঝুটালাল আর দেরি করলো না। সোজা স্যর গটগটির ঘরের পানে রওনা হলো। ঘরের সামনে এসে দেখলো স্যর গটগটির দরজাটা ভেজানো। নিশ্চয় অনোখী তার আগেই এসেছে স্যর গটগটির ঘরে। না, কোন ভুল নেই।

ঝুটালাল ভাবলে একবার দরজায় একটু উঁকি মেরে দেখাই যাক না।

ঝুটালাল দরজাটা ফাঁক করে উঁকি মারলে। কিন্তু ভেতরে যাকে দেখতে পেলে তাকে দেখে তার চক্ষু স্থির।

এতো স্যর গটগটি নয়—এ যে বাইভি সাহব।

বিস্ময়ের প্রথম ঘোরটা কেটে যাবার পর ঝুটালাল কাতরকণ্ঠে প্রশ্ন করলে : বাইভি সাহব! আপভী ইধার আসিয়ে গেছেন।

ঝুটালালকে দেখে বাইভিও প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাইভি, সাহেব। তাই চট করে নিজেকে সামলে নিলে। বললে : আরে 'গুড লর্ড'। এ যে ঝুটালাল দেখছি। তুমি যে এখানে, কী ব্যাপার? আবার কাকে ফাঁসাচ্ছো?

—কিসি কো নহী, বাইভি সাহব। আরে ইধর আসিয়ে হমি খুদই ফাঁসিয়ে গেলাম।

—ব্যাপারটা কী বলো দিকি নি? বাইভি প্রশ্ন করে।

—রাম রাম বাইভি সাহব। আপ বোলছেন কী? আপ শোনেন নি।

—না তো কী ব্যাপার ?

—অনোখীর কাছে সেভেন্থ হেভেনের শেয়ার ঢাই লাখ রুপেয়া মে বিক্রি কোরিয়ে দিলাম।

—এবার বাইভির বিস্ময়ের পালা। সে বলে : তুমি বলছো কী ঝুটালাল ? অনোখীর কাছে বিক্রি করলে ঐ বোগাস কোম্পানীর শেয়ার। আরে, আমি তো শুনলাম তোমার কোম্পানীর এখন পর্যন্ত সাইনবোর্ডই গজায় নি, তা আবার পাখা গজাবে কবে! না, ঝুটালাল তুমি আমায় অবাক করলে। সত্যি তুমি করিতকর্মা পুরুষ। বলি টাকা পেয়েছো অনোখীর কাছ থেকে ?

—নহী জী, কাল সুবহকো মিলবে। হমি ভী শয়তান আছি। হমি বোলিয়েছি, অনোখী, তুই হমার বচপনের দোস্ত। ইস লিয়ে তুই আমায় সব রূপায়া দিবি, উসি বখত হমি ভী শেয়ার দিয়ে দেবো।

—তাহলেই পেয়েছো আর কী।—বাইভি এবার হেসেই জবাব দেয়।

—আপ সচমুচ বোলিয়েছেন কী অনোখী হমার পোয়সা দেবে না।

—আলবাৎ দেবে না। কোন দেশনেতা কী জিনিস কিনে পয়সা দেয়। আজ পর্যন্ত কেউ দেয় নি। শোন, ঝুটালাল তুমি বোধহয় শোন নি যে অনোখী আজ বাদে কাল এক বিরাট দেশনেতা হতে যাচ্ছে। এইজন্যেই তো এই বিরাট যজ্ঞ। যজ্ঞ শেষ হবার পরে অনোখীর টিকিরও নাগাল পাবে না।

—আপ কী বাত বোলছেন বাইভি সাহব।

—ঠিকই বলছি হে ঝুটালাল। বিশ্বাস না হয় একবার শাদীলালকে প্রশ্ন করে দেখো। শাদীলালই তো খোঁজ নিয়ে এসেছে অনোখীর এই দেশনেতা হবার আসল মতলবটা কী : মানে

তোমার আমার সবারই কীর্তি জনসাধারণের কাছে বলে বেড়াবে। আর বিধান সভায় আমাদের গুণগান গাইবে। শুধু তাই নয়—তারপর জন্মদিনের টাকার তোড়া প্রেজেন্ট পাবে। পঞ্চাশ হাজার টাকার তোড়া। বছরে তিনবার করে যদি জন্মতিথি করে তা হলে কতো হয় ঝুটালাল?

—বাইভি সাহব আপ হমে বোহুত তাজ্জব বনাইলেন। আভি তো কুছু সলাহ্ দিন। নইলে রূপেয়া ভী গেলো, আউর এক রোজ জিন্দীগি ভী যাবে।

এবার বাইভির বলবার পালা ঃ আমিও তো সেই কথা ভাবছি হে ঝুটালাল। এবার দেখছি টাকায় টাকা, প্রাণে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়লো।

—বাইভি সাহব হমি এখুনি গিয়ে অনোখীকে গিয়ে বলবো ঃ অনোখী তুই দুশমন আছিস। তোর দেশনেতা হোবার কী মতলোব আছে, ইয়ে হমি জানি—

—তারপর, তারপর কী বলবে শুনি, বাইভি উৎসুক প্রশ্ন করে।

—জোরুর বলবো, হমায় বাইভি সাহব বাতালো যে তুই হমার সব কুছু বোলিয়ে দিবি।—

উৎসুক কণ্ঠ থেকে এবার বাইভির কণ্ঠস্বরে এক আর্তনাদ শোনা গেলো। সে প্রায় চীৎকার করেই বলে উঠলো ঃ বলো কী হে ঝুটো, তুমি কী অনোখীকে গিয়ে বলবে যে আমি এসব তোমায় বলেছি। মানে স্যর গটগটি আমি।

—আলবাৎ বলবো। উস মে কী দুষ আছে। সাচ বাত কহেনে মে আমি ডরাই না। স্রিফ ইনকম ট্যাক্স বিনা।

—তাহলে ঝুটালাল আমায়ও বাধ্য হয়ে অনোখীকে বলতে হবে তোমার ঐ সেভেন্থ হেভেন এয়ারওয়েজ হলো গিয়ে বোগাস

কোম্পানীর শেয়ার। মানে কোম্পানীর এ অবধি সাইনবোর্ডই গজায় নি—পাখা তো দূরের কথা। অর্থাৎ তুমি অনোখীর কাছ থেকে ধাপ্পা দিয়ে টাকা আদায় করছো।

এবার ঝুটালালের আর্তনাদের পালা।

—বাইভি সাহব, আপ এহি বাত সবকুছু বোলিয়ে দেবেন।

—তা নয়তো কী। শোন ঝুটালাল, আমার প্রস্তাবটা শুনে নাও। তুমিও বাঁচবে, আমিও বাঁচবো। এসো আমরা 'জয়েন্ট' খুলি।

—জয়েন্ট স্টক কোম্পানী—ঝুটালাল বলে।

—আরে না। মানে এসো আমরা জয়েন্টলি কাজ করি।

—কতো দিবেন হমায়—

—আধা-আধি। মানে ধরো তুমি তোমার শেয়ার বিক্রি করো অনোখীর কাছে আমি কিছুই বলবো না, আর আমি আজ রাত্তিরে দোলনা সেনের লেখা বক্তৃতা চুরি করে নেবো। আমি টের পেয়েছি ঐ বক্তৃতায় আমাদের নামে অনেক কেচ্ছা লেখা আছে। আর ঐটে যদি একবার বাগাতে পারি তাহলে অনোখী ব্যাটা আর মুখ খুলতে পারবে না প্রেস কনফারেন্সে—মানে 'হি ইজ ফিনিসড্'। অতএব অনোখীর শেয়ার বিক্রি করতে আমি তোমায় সাহায্য করবো আর ঐ বক্তৃতা হাতড়াতে তুমি আমায় সাহায্য করবে। কেমন রাজী?

—আলবাৎ রাজী। তবে যো কুছু কম্ আজহী কোরিয়ে নিবো।

—হ্যাঁ, আজ রাত্রেই।

এবার ঝুটালাল যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো।

বাইভি বললে: দাঁড়াও ঝুটা, আমিও তোমার সঙ্গে বেরুবো। এই বন্ধ ঘরে আর থাকতে পারি নে। চলো ঐ বাইরের রেস্তোরাঁয় বসে একটু কফি খেয়ে আসি।

—ঠিক বাত বোলিয়েছেন। হমার ভী বোহুত ভুখ লাগিয়েছে। ইধার তো না মিলে পানি না মিলে খানা—'

—দাঁড়াও আমি দাড়িটা পরে নি। যতো সব জ্বালাতন। এটা না পারলে পর লোকগুলো ধরে ফেলবে যে—'

দাড়িটা পরে বাইভি ঝুটালালকে নিয়ে বেরুলো। রাস্তায় দেখতে পেলে ঘুঘুরাম তার দিকে সতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ঝুটালালকে প্রশ্ন করলে লোকটা কে হে ?

আরে বাইভি সাহব উ তো কাগজকা রিপোর্টার আছে। চৈ-হৈ কী নাম...হ্যাঁ, চৈ-হৈ পাণ্ডে।

—বলো কী হে। অনোখী তাহলে বেশ আঁটঘাট বেঁধে যজ্ঞ করতে নেবেছে দেখছি। কাগজের রিপোর্টারও নিয়ে এসেছে। না ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস হয়ে উঠেছে দেখছি।

দোলনার মুখে ইণ্টারন্যাশনাল গ্যাংস্টারের আগমনের কথা শুনে ঘুঘুরাম বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। তাই সে একবার নিজের চোখে লোকটাকে পরখ করে নিতে চাইলে। স্তর গটগটির ঘরের বাইরে এক জানালা থেকে সে স্তর গটগটির দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু যাকে সে দেখতে পেলো সে তো একজন সুপুরুষ, সাহেব মানুষ, শেয়ার মার্কেটের রাজা ঝুটালাল লুটেরমলের সঙ্গে কথা বলছে। কে বলেছে ঐ লোকটা ইণ্টারন্যাশনাল গ্যাংস্টার। দোলনার যত কাণ্ড !

মনের আনন্দে ঘুঘুরাম আবার শিষ দিতে লাগলো।

একটু বাদে সে ঘরের পানে হাঁটা দিল !

ঠিক সিঁড়ির কাছে এসে দেখতে পেলো স্তর গটগটির ঘর থেকে দুজন লোক বেরিয়ে আসছে। একজন ঝুটালাল লুটেরমল—অন্যজন দাড়িওয়ালা...

একী ব্যাপার, এ লোকটা কে ? এইমাত্র তো সে দেখে এলো যে একজন সাহেব মানুষ ঝুটালালের সঙ্গে কথা বলছে। তা হলে কি দাড়িটা নকল। সত্যই এই হলো একজন ইন্টারন্যাশনাল গ্যাংস্টার সব কিছু মিলিয়ে দেখলে ঘুঘুরাম।—ঝুটালাল, শেয়ার মার্কেট, অনোখীলাল, গজানন বাটপারিয়া ও তার ফাইফ ইয়ার প্ল্যান এবং নকল দাড়ি।

উফ্ কী বিরাট ষড়যন্ত্র! শীগ্‌গিরই যে এ বাড়িতে একটা লোমহর্ষক কিছু ঘটবে এ বিষয়ে ঘুঘুরামের সন্দেহ রইল না। লোকটা জাল। স্যর গটগটি নয়। হয়ত তার নাম ভাঁড়িয়ে এসেছে কিংবা স্যর গটগটিকে খুন করে—

বাকীটা ঘুঘুরাম ভাবতে পারলে না। উত্তেজনায় তার শরীর কাঁপতে লাগলো।

সে দোলনার খোঁজে বেরুলো। দোলনাকে জানাতে হবে--মৃত্যু বিভীষিকা এ বাড়িতে ঘনিয়ে আসছে।